ISSN-0971-8397

যোজনা

ধনধান্যে

সেপ্টেম্বর ২০১৪ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ১০

নগর পরিকল্পনা

বস্তিমুক্ত ভারতের পরিপ্রেক্ষিত যে চ্যালেঞ্জ জাতিকে গ্রহণ করতেই হবে
অমিতাভ কুণ্ডু

স্মার্ট শহরের পরিকল্পনা
এস. চন্দ্রশেখর ও নীহারিকা ভেঙ্কটেশ

নগর মাঝে গ্রামীণ ইস্যু
নরেন্দর পানি

ভারতের নগর নীতি অতীতাবলোকনে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ
আর বি ভগৎ

শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার কৃষি
সগর মৈত্র

নগর পরিকল্পনা—বাস্তবায়ন, সমস্যা ও পরিবর্তিত ধরন
মহুয়া বর্ধন

লালকেল্লা প্রাঙ্গণ থেকে

ভারতের জন্য প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন

দরিদ্রদের জন্য বিমা

দেশের দরিদ্রতম নাগরিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সুবিধা দিতে একটি প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। 'প্রধানমন্ত্রী ধন যোজনা'র আওতায় যাঁদের অ্যাকাউন্ট খোলা হবে তাঁরা প্রত্যেকে একটি ডেবিট কার্ড এবং এর সঙ্গে প্রতিটি পরিবার এক লক্ষ টাকার বিমার সুযোগ পাবেন। বিপদের সময়ে দরিদ্র পরিবারগুলি এর সুযোগ নিতে পারবেন।

সাংসদদের আদর্শ গ্রামের প্রকল্প ঘোষিত

প্রধানমন্ত্রী 'সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা' চালু করার কথাও ঘোষণা করেছেন। সাংসদরা সময়, স্থান এবং ওই এলাকায় অবস্থান অনুযায়ী তাঁদের নির্বাচনী ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত তিন থেকে পাঁচ হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট যে কোনও একটি গ্রাম বেছে নেবেন। গ্রামে প্রচলিত স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ ও সবুজের অবস্থা এবং সৌহার্দ্যের পরিবেশ এই সমস্ত মানদণ্ডের বিচারে প্রত্যেক সাংসদকে ২০১৬ সালের মধ্যে তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত একটি গ্রামকে 'আদর্শ গ্রাম' হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। ২০১৬ সালের পর আরও দুটি গ্রামকে বেছে নিতে হবে এবং ২০১৯ সালের পর প্রত্যেক সাংসদের কার্যকালের পাঁচ বছর মেয়াদের মধ্যে তাঁর এলাকায় অন্তত ৫টি 'আদর্শ গ্রাম' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শহরাঞ্চলের সাংসদ তথা রাজ্যসভার সদস্যরাও একটি করে গ্রাম 'দত্তক' নিতে পারেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মজয়ন্তীতে আগামী ১১ অক্টোবর 'সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনার'র একটি সম্পূর্ণ ব্লু-প্রিন্ট বা খসড়া পরিকল্পনা সমস্ত সাংসদ ও রাজ্যগুলির কাছে পেশ করা হবে।

ব্র্যান্ড ভারত

ভারতকে একটি 'উৎপাদন কেন্দ্র' বা 'ম্যানুফ্যাকচারিং হাব' গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন একমাত্র উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রসার ঘটিয়ে দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে এবং আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে। এইভাবেই দেশের যুব সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সামর্থ্যের যথার্থ ব্যবহার হতে পারে। 'ব্র্যান্ড ভারত'কে বিশ্বের দরবারের একটি সর্বজনমান্য নাম হিসাবে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন—'আসুন, ভারতে তৈরি করুন', 'আসুন, ভারতে উৎপাদন করুন'। তিনি যুব সম্প্রদায়কে অন্তত এমন একটি সামাগ্রী বিশেষত অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পসামগ্রী উৎপাদনে সাহায্য করতে আহ্বান জানিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে তা বিদেশ থেকে আমদানির প্রয়োজন না পড়ে। তিনি বলেছেন, আমাদেরও এমন এক অবস্থায় নিজেদের নিয়ে যেতে হবে যখন এই ধরনের সামগ্রী রপ্তানি করতে পারব। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমাদের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর প্রত্যেকে যদি এই ধরনের অন্তত একটি সামগ্রী উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকে ভারত তাহলে পণ্য রপ্তানিকারক দেশেই পরিণত হবে। ভারতীয় উৎপাদনকারীদের দুটি বিষয়ের সঙ্গে কখনওই আপস না করার অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী—পণ্যক্ষেত্র ত্রুটিমুক্ত এবং সম্পূর্ণ কার্যকরী হয়। পণ্যের উৎপাদন এমনভাবে হবে যাতে তার মধ্যে কোনও ত্রুটি না থাকে। রপ্তানি করা পণ্যসামগ্রী যেন বাতিল না হয় এবং পরিবেশের ওপর তার যেন কোনও ক্ষতিকর প্রভাব না থাকে।

স্বচ্ছ ভারত

পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এই বছরের ২ অক্টোবর 'স্বচ্ছ ভারত' নামে একটি কর্মসূচি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁর সরকার। মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধশতবার্ষিকী অর্থাৎ ২০১৯ সালের মধ্যে এই কর্মসূচি সম্পন্ন করা হবে। আনুষঙ্গিক উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে প্রধামন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শৌচালয় নির্মাণের অঙ্গীকারের মাধ্যমে 'স্বচ্ছ ভারত'-এর পথে অবিলম্বে প্রথম পদক্ষেপ শুরু হচ্ছে। বালিকাদের জন্য পৃথক শৌচালয়সহ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এক বছরের মধ্যে শৌচালয় গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সাংসদদের উদ্দেশ্যে তাঁদের এমপিএলএডি অনুবিলের অর্থ ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে কর্পোরেটগুলির সামাজিক দায়িত্বের অঙ্গ হিসাবে বিদ্যালয়গুলিতে শৌচালয়ের ব্যবস্থা করার দিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যও কর্পোরেট ক্ষেত্রের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন আগামী ১৫ আগস্ট আমরা যেন জোর গলায় বলতে পারি দেশের কোনও বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচালয় গড়ে তোলার কাজ বাকি নেই।

কন্যারাই সম্পদ

যে দেশে প্রতি হাজার পুত্রসন্তান পিছু ৯৪০ জন কন্যাসন্তান জন্মায় সে দেশে পুরুষ-নারীর এই উদ্বেগজনক ভারসাম্যহীনতা নিয়ে গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করতে জাতির উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কন্যাভ্রূণ হত্যায় কোনও রকম মদত না দেওয়ার জন্য চিকিৎসকদের উদ্দেশে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে পুত্রসন্তান লাভের আশায় কন্যাসন্তানদের বলি না দেওয়ার জন্য পরিবারগুলির কাছেও আবেদন জানান তিনি। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক কমনওয়েল্থ গেমসে যে ৬৪ জন ক্রীড়াবিদ পদক জিতেছেন, তাঁদের মধ্যে ২৯ জনই মহিলা। কন্যাসন্তানদের কৃতিত্বে গর্বিত হওয়ার জন্য জাতির উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কন্যাদেরও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার সুযোগ দেওয়া হোক।

SOME IMPORTANT TITLES OF PUBLICATIONS DIVISION

1. The Economic History of India—Vol-One	175.00
2. The Economic History of India—Vol-Two	260.00
3. Babu Jagjivan Ram	132.00
4. Conscience of the Race—India's Off beat Cinema	240.00
5. Indian Navy—a Perspective	300.00
6. Growing Fruits and Vegetables	240.00
7. Children in India—A Legal Perspective	75.00
8. Indian Railways—Glorious 150 years	250.00
9. Media Ethics	100.00
10. The Story of India's Struggle for Freedom	75.00
11. India In the Space Age	235.00
12. Folk Arts and Social Communication	125.00
13. Aspects of Indian Music	60.00
14. A Brief History of Water Resources in India	70.00
15. The Charkha and the Rose	75.00
16. Ramananda Chattopadhyay	75.00
17. R. N. Tagore	95.00
18. Some eminent Indian Scientist	125.00
19. Subhas Chandra Bose	100.00
20. Khudiram Bose (Beng.)	75.00
21. Indian Civilisation and the Science of the Fingerprinting	160.00
22. Story of INA	35.00

Available at :

SALES EMPORIUM :
8, Esplanade East ; Kolkata-700 069
Ph. : 2248-6696, 2248-8030

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 10.00

September, 2014
REGISTERED No. KOL-RMS/109/2014
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং বেতার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অ্যাডিশনাল ডায়রেক্টর জেনারেল শ্রীমতী বীণা জৈন কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার,
৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

সেপ্টেম্বর, ২০১৪

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেশ কুমার ঝা**

সম্পাদনায় : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- বস্তিমুক্ত ভারতের পরিপ্রেক্ষিত যে চ্যালেঞ্জ জাতিকে গ্রহণ করতেই হবে — অমিতাভ কুণ্ডু — ৫
- স্মার্ট শহরের পরিকল্পনা — এস. চন্দ্রশেখর ও নীহারিকা ভেঙ্কটেশ — ৮
- নগর মাঝে গ্রামীণ ইস্যু — নরেন্দর পানি — ১০
- ভারতের নগর নীতি অতীতাবলোকনে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ — আর বি ভগৎ — ১৩
- শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার কৃষি — সগর মৈত্র — ১৮
- নগর পরিকল্পনা—বাস্তবায়ন, সমস্যা ও পরিবর্তিত ধরন — মহুয়া বর্ধন — ২৪
- দেশের শহরগুলির জন্য অর্থসংস্থানের নিয়মিত ব্যবস্থা — আনন্দ সহস্রনামন এবং বিষ্ণু প্রসাদ — ২৯
- নগরায়ণ এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ—শহরের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন নতুন ধ্যানধারণা — ললিতা কামাথ — ৩৪
- ভারতে নগরায়ণ ও কিছু ভাবনা — লক্ষ্মীনারায়ণ শীল — ৩৮
- নগর উন্নয়ন, জনসংখ্যা ও বাসস্থান — ইমন কল্যাণ জানা — ৪২
- নগরায়ণ পরিকল্পনা ও পরিচালনা কেরিয়ার অপশন প্রচুর — কল্যাণ মৈত্র — ৪৫
- ভারত কি 'সপ্রতিভ' শহুরে ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় প্রস্তুত? — ড. রলি অরণ্য এবং চেতন বৈদ্য — ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত — ৫২
- জানেন কি? রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা) — মলয় ঘোষ — ৫৯
- ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভিস — মহুয়া গিরি — ৬১
- যোজনা ক্যুইজ — জয়ন্ত সাহা — ৬২

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

দ্বৈত শহরের কাহিনি

কালিবঙ্গান। ঘগ্গর নদীপাড়ে হরপ্পা সভ্যতার লুপ্ত নগর। ছিমছাম সিধে সিধে রাজপথ। কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে সেই পথে আপনি পায়ে হেঁটে চলেছেন। ঝকঝকে তকতকে পরিবেশ। পরিপাটি নিকাশি ব্যবস্থা। নাগরিক ও বাণিজ্যিক কর্মব্যস্ততা তুঙ্গে। আপনি বিমোহিত। প্রাক্-ঐতিহাসিক কালিবঙ্গানের শহর পরিকল্পনায় তাজ্জব না মেনে উপায় কী। এবার যাওয়া যাক, দু-চার হাজার বছর আগেকার পুণ্যসলিলা গঙ্গাতীরের কাশীতে। বেগবতী যমুনার কোলে শাহজাহানাবাদে। আর হালফিল নিউইয়র্কের সিলিকন অ্যালি, সাংহাইয়ের ওয়ার্ল্ড ফিন্যান্সিয়াল সেন্টার ও বেঙ্গালুরু সাইবার সিটি। দুচোখ জুড়ে আনে মুগ্ধতার আবেশ। আদায় করে নেয় সমীহ মিশ্রিত তারিফ। সত্যি তো, শহরগুলি মানব সভ্যতার বস্তুগত সাফল্যের চূড়া। খেদের কথা, শহরের অন্দরে তলে তলে অসম সুযোগ, বিভেদ, কদর্যতা, বিচ্ছিন্নতা ও বঞ্চনা বহাল। এসব আধুনিক শহর-জনপদের বৈশিষ্ট্য। বহুতল ইমারতের ছায়ায় ঝুপড়িবাসীদের দিন গুজরান। চোখ ধাঁধানো অফিস-বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স এর ঠিক পিছনে অরক্ষিত ফুটপাত। যা কিনা ভেলকি দেখিয়ে রাত নামলে এক ঢাউস সমাজশায়নগৃহের ভোল নেয়। ফুটপাতবাসীরা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার তোয়াক্কা করে না। ঘুমনোর সময় তাদের প্রার্থনা, বিলাসবহুল গাড়ি চাপা পড়ে যেন খবর না হতে হয় সকালের কাগজে। ম্যাক্সিমাম সিটি মুম্বই হংসমধ্যে বকো যথা নয়। আধুনিক শহরের রূপক মাত্র। সর্বাধিক আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণের এক মাধ্যম। অথচ জল, বাতাস, জায়গা.....নিয়ে সেখানে চলছে নিরন্তর এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

যোজনা

শহরায়ন আমাদের অবিসংবাদিত ভবিষ্যৎ। বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিবৃত্ত ঘাঁটলে দেখা যায় নগরবিকাশ শুধুমাত্র স্বাভাবিক ও অপরিহার্য নয়, কাম্যও বটে। পরিসর সংকোচন ও উৎপাদনশীল শক্তিগুলিকে একঠাঁই করে শহরায়ণ দক্ষতা গড়ে তোলে। বিকাশ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে এই দক্ষতা। তবে কিনা, শহরকে উৎপাদনশীল উদ্যোগ ও সৃজনাত্মক কেন্দ্র হয়ে উঠতে গেলে সতর্ক পরিকল্পনা জরুরি। বাইরের থেকে পরিকল্পনা চাপিয়ে দিতে হবে এমন কথা নেই। শহরের পরিকল্পিত বিকাশের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে আধুনিক শহরায়ন ভিশনের সঙ্গে তা যুক্ত করলে ভবিষ্যৎ শহরের একটা রূপরেখা আমরা পেতে পারি।

আগাপাশতলা কাচে মোড়া বহুতল হর্ম্যরাজিতে ঢাকা আজ শহরের আকাশ। এসব অট্টালিকায় শক্তি খরচ হয় বিস্তর। শহরায়নে ভুল মডেলের মাশুল আর কী। শহর পরিকল্পকরা ইদানীং তাই আজও বহালতবিয়ত শত শত বছরের পুরানো নগরগুলির পানে তাকাচ্ছেন। তত্ত্বতালাশ করে দেখছেন পরিবেশে কুপ্রভাব না ফেলে এসব শহর কীভাবে আবাসন, রুজিরোজগার ও সৌহার্দ্যের ব্যবস্থা করছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তো বলা বাহুল্য, আত্মহত্যা, খুনজখম, দুর্ঘটনা, আধিব্যাধি, বৃদ্ধদের অবহেলা, মাথা গোঁজার ঠাঁইহারা মায় বিবাহ বিচ্ছেদ এর সংখ্যা অরগ্যানিক উন্নয়নে শহরের সাফল্য বা ব্যর্থতার কষ্টিপাথর।

পরিকল্পকরা বেশ বুঝতে পারছেন পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়ণ প্রক্রিয়ায় অগুনতি মুখ বুজে থাকা অতি সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ জরুরি। পরিকল্পনা তো মূলত এদের জন্য। এই মানুষজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তা সে সদ্য গড়ে ওঠা বা পুরানো অরগ্যানিক শহর যা-ই হোক না কেন। শহরে কর্মী বাহিনীর প্রায় ৭৫ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। এরা কলকে না পেলে যে কোনও পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বাধ্য। শহরের আনাচেকানাচে গজিয়ে ওঠা ঝুপরি থেকে মেলে কম টাকায় কাজের লোক। ঝি থেকে কলের মিস্ত্রি। বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী বা ইলেকট্রিশিয়ান। বলা যায়, উঁচুতলার লোকের আরাম আয়েসের জন্য এক ধরনের ভরতুকি জোগাচ্ছে বস্তিবাসীরা। প্রতিটি শহরের মাঝে সেঁধিয়ে আছে আরেক শহর। যাতনা, বঞ্চনা আর অবিচারের শিকার সেই ভিন শহর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। হতকুচ্ছিত এই দ্বৈত শহরের কাহিনি। এই আখ্যান অবশ্যই বদলানো দরকার। নিকৃষ্টকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করে উৎকর্ষের আবাহন করতে হবে। আরও দেরি নৈব নৈব চ। যত শিগগির তত মঙ্গল।❑

বস্তিমুক্ত ভারতের পরিপ্রেক্ষিত

যে চ্যালেঞ্জ জাতিকে গ্রহণ করতেই হবে

দেশের শহরগুলিকে বস্তিমুক্ত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গৃহীত এক বৃহৎ কর্মসূচি হল রাজীব আবাস যোজনা। বাস্তবক্ষেত্রে জমির দুষ্প্রাপ্যতা, বস্তিবাসীদের চিহ্নিতকরণ, ঋণ পরিশোধে তাঁদের অক্ষমতার মতো বিষয়গুলি কীভাবে এই প্রকল্প রূপায়ণের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে, লেখক **অমিতাভ কুণ্ডু** *তাঁর বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। সমস্যাগুলি থেকে উত্তরণের পথনির্দেশও রয়েছে এই নিবন্ধে।*

ভারতের শহরকে বস্তিমুক্ত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গৃহীত একটি বৃহৎ কর্মসূচি হল রাজীব আবাস যোজনা। কিন্তু এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়ে গেছে। এই কর্মসূচিকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীনতার পর থেকে মাথার ওপর একটুকরো ছাদের স্বপ্ন দেখে আসা দরিদ্র ও গৃহহীন মানুষজন ভেবেছিলেন, এতদিনে তাঁদের স্বপ্ন সাকার হতে চলেছে। রিয়েল এস্টেট লবি, যাঁরা এই বুঝি আবাসন শিল্পের বুদ্বুদ ফাটল বলে গত দেড় দশক ধরে ভয়ে ভয়ে ছিলেন, তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন আবাসন ক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহ ও ছাড়ের সম্ভাবনায়। পাশাপাশি ব্যাংকিং ক্ষেত্র উৎসাহিত হয়েছিল গৃহ ঋণের চাহিদা বাড়ার প্রত্যাশায়। বস্তিমুক্ত ভারতের কল্পনায় সব থেকে বেশি উত্তেজিত হয়েছিলেন শহুরে মধ্যবিত্ত ও অভিজাতশ্রেণি। তাঁরা মনে করেছিলেন, এবার তাঁদের শহরে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রভৃতি আর থাকবে না, কারণ সাধারণত বস্তিগুলিই এইসবের আঁতুড়ঘর হিসাবে পরিচিত।

রাজীব আবাস যোজনার পরিকাঠামো ও বাস্তবায়ন

রাজীব আবাসন যোজনার বিষয়বস্তু ও পরিধিকে বিচার করতে হবে দেশে গত তিন দশক ধরে চলে আসা বর্জনমুখী নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে। জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর পুনর্নবীকরণ মিশন হল রাজীব আবাস যোজনার প্রকৃত সূচনা বিন্দু। শহরগুলিকে 'সপ্রতিভ' এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তোলার যে দাবি উঠেছিল, তার সাপেক্ষে রাজীব আবাস যোজনার মূল্যায়ন করা উচিত। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, জওহরলাল নেহরু নগর পুনর্নবীকরণ মিশনের আওতায় শহরগুলিতে জমির জোগান, বস্তিগুলির বাছাই, বস্তিবাসীদের যোগ্যতা, তাদের সামর্থ্য প্রভৃতির প্রেক্ষিতে রাজীব আবাস যোজনার পরিকাঠামো বিচার করা উচিত (Kundu 2012)। এই চারটি বিষয়ের সঙ্গেই শহরে জনগোষ্ঠীগত বিকাশের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে দরিদ্রদের অবস্থা, শহরগুলির 'অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও দক্ষতা'-র প্রতিফলন বলা যেতে পারে।

জমি পাওয়া এবং তার উপযুক্ততা

রাজীব আবাস যোজনায় রূপায়ণকারী সংস্থার কাছে সব থেকে বড় চিন্তার বিষয় হল বিনামূল্যে জমি পাওয়া। কোনও রাজ্য বা শহর এই মিশনের জন্য বিনামূল্যে জমির ব্যবস্থা না করতে পারলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আর্থিক বরাদ্দের দাবিও জানাতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন হল, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কীভাবে বিনামূল্যে জমির সংস্থান করবে। বস্তিবাসীরা মোট শহুরে জনসংখ্যার ১৮ থেকে ২০ শতাংশ হলেও তাঁদের দখলে রয়েছে মাত্র ৩ থেকে ৪ শতাংশ শহুরে জমি। কেউ ভাবতে পারেন, এই জমিটুকু তো অন্তত বিনামূল্যে রাজীব আবাস যোজনার জন্য পাওয়া যাবে। কিন্তু সমস্যা হল, অধিকাংশ বস্তিই শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, যেখানে জমির দাম খুব চড়া। আর তাই এই জমি আত্মসাৎ করতে বহু স্বার্থান্বেষীমহল ওত পেতে বসে রয়েছে।

একই সঙ্গে এসে পড়ে জমির সঠিক বাছাইয়ের প্রশ্ন। রাজীব আবাস যোজনার নির্দেশিকা অনুযায়ী, জমির ৭৫ শতাংশ বস্তিবাসীকে সেখানেই বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বাকি ২৫ শতাংশকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এতে বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, কারণ ৭৫ শতাংশ বস্তিবাসীকে সংশ্লিষ্ট জমিতেই বসবাসের সংস্থান করে দিলে বাকি ২৫ শতাংশকে অন্যত্র ঠিকই ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।

বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু একেবারেই আলাদা। যে জমিতে বস্তি গড়ে ওঠে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা জবরদখল করা। তাই এ সংক্রান্ত উদ্যোগ শুরু হলেই জমির মালিকরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য বা বিক্রির জন্য জমি ফিরে পেতে চান। বাস্তব ক্ষেত্রে তাই, শহরের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী যে জমির ব্যবহার নির্দিষ্ট নয় বা যে জমির মালিক নেই, একমাত্র সেই জমিই যোজনার জন্য পাওয়া যায়। অনেক শহরে আবার লাভজনকতার দিক থেকে বিষয়টি দেখা

হয়। যে জমির বাজারদর কম, একমাত্র সেই জমিকেই চিহ্নিত করা হয় প্রকল্পের জন্য (Kundu 2012)।

জমি পাওয়া নিয়ে সমস্যা এবং জমি চিহ্নিতকরণ নিয়ে মতের বিভিন্নতার কারণে বহু শহরে রাজীব আবাস যোজনার কাজ সেভাবে শুরুই হতে পারেনি। বহু জায়গায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ও বাসিন্দারা জমি অধিগ্রহণে আপত্তি জানিয়েছেন। তৃণমূল স্তরে তীব্র বিরোধিতায় রূপায়ণকারী সংস্থা বা জেলা স্তরের কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করতেই ব্যর্থ হয়েছেন। জাতীয় পরামর্শদাতা কমিটি এইসব বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব জেলাশাসকদের ওপর ন্যস্ত করার সুপারিশ করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এ সম্পর্কিত স্পষ্ট নীতি-নির্দেশিকা না পেলে জেলাশাসকদের পক্ষেও এই কাজে এগোনো সম্ভব নয়।

NSS থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রকৃতি অনুযায়ী বস্তিগুলির শ্রেণিবিভাগ করা যায়। এমনকী NSS-এর সমীক্ষা থেকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব, যার মাধ্যমে আরও বস্তুনিষ্ঠভাবে বস্তিগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন ধরুন, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলিতে ৭০ শতাংশ বস্তিকে এইভাবে চিহ্নিত করা হল। কোনও শহরে এই হার ৬৫ শতাংশ হতে পারে, আবার কোথাও বা ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ, জাতীয় বা রাজ্যস্তরে ন্যূনতম কোনও হার সুনির্দিষ্ট না থাকায় অনেক জায়গায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মাত্র ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বস্তিকে চিহ্নিত করে। যতক্ষণ না কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি নির্দেশিকা জারি করে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করছে, ততক্ষণ স্থানীয় স্তরে এর মীমাংসা হওয়া এবং আইনি জটিলতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যাই হোক, কোনও রাজ্যের অন্তত ৭৫ শতাংশ বস্তিকে প্রকল্পের আওতায় আনা বাধ্যতামূলক করা হলে স্থানীয় স্তরে অন্যায়ভাবে জমি দখল অনেকটাই কমে যাবে। চিহ্নিত জমি বেসরকারি উদ্যোগের জন্য ব্যবহার করাও যাবে না।

যোগ্য পরিবারগুলির চিহ্নিতকরণ

জমি পাওয়া এবং তার উপযুক্ততা হল জোগানের দিকের সমস্যা। চাহিদার দিকে রয়েছে যোগ্য পরিবারগুলির চিহ্নিতকরণ এবং তাদের সামর্থ্য। প্রকৃতপক্ষে, ভরতুকিযুক্ত আবাসনের ক্ষেত্রে এই যোগ্যতা নির্ধারণকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠেছে, যা রাজীব আবাস যোজনার রূপায়ণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তি এলাকায় কে জমির পাট্টা ও বাড়ির মালিকানা পাবার যোগ্য আর কে নয়, তা কীভাবে নির্ধারণ করা হবে? অনেক নাগরিক সংগঠনের মত হল, এমন বাছ-বিচার না করে প্রতিটি বস্তিবাসীকেই যোগ্য বলে ঘোষণা করা উচিত। কিন্তু সমস্যা হল, বস্তি এলাকায় জমি মাফিয়ারা অত্যন্ত শক্তিশালী। তারা প্রচুর ভুয়ো লোককেও বস্তিবাসী হিসাবে দেখিয়ে দেবে। সেজন্যই যোগ্য পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করতে একটি মাপকাঠি স্থির করা প্রয়োজন। কোনও সরকারি সংস্থাকে এই চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব দিলে তারা অবধারিতভাবেই বস্তিবাসীদের কাছে প্রমাণ হিসাবে ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড প্রভৃতি চাইবে। তাতে কিন্তু এই মিশনের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে, কারণ কয়েক দশক ধরে বসবাস করলেও বহু বস্তিবাসীর কাছেই এইসব নথিপত্র নেই।

নয়ের দশকের শেষের দিকে মহারাষ্ট্র সরকার ও মুম্বই পৌর নিগমের সঙ্গে একযোগে এ সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে Society for the Promotion of Area Resource Centre—SPARC। নির্দিষ্ট ঠিকানায় আসা চিঠি, জমি হস্তান্তরের কাগজপত্র, ঠিকানা-সহ ওষুধের বিলের মতো ১৬-১৭টি এমন নথির তালিকা তাঁরা তৈরি করেছেন, যা বিবেচনার যোগ্য। এমনকী কোনও কাগজপত্র না থাকলেও ২০টি পরিবারের মানুষজন যদি কোনও ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে বসবাসের সাক্ষ্য দেন, তাহলে তাকেও প্রামাণ্য হিসাবে গ্রাহ্য করার কথা বলা হয়েছে। এইসবই স্থির করা হয়েছে একটি সমীক্ষার মাধ্যমে, যাতে পৌরসভা, রাজ্য সরকার, নাগরিক সংগঠন ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। এই চারটি পক্ষের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত শংসাপত্রের ভিত্তিতে যোগ্য পরিবারগুলির মধ্যে জমির পাট্টা বিতরণ করা হয়।

কোন তারিখ পর্যন্ত শহরে আসা বস্তিবাসীদের যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে, সমীক্ষার জন্য তা স্থির করা দরকার। অবশ্য সবার জন্য যে একেবারেই তারিখ নির্দিষ্ট করতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। এই ধরনের সমীক্ষা আনুষ্ঠানিক হলেও নথিপত্র ও পদ্ধতিগত দিক থেকে এর মধ্যে যাতে নমনীয়তা থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সকলের অংশগ্রহণও বিশেষ জরুরি। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, সমীক্ষার আইনগত বৈধতা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এর সঙ্গে যুক্ত থাকা। স্থানীয় গোষ্ঠীর অংশগ্রহণও একইরকম গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, বস্তি সমীক্ষার জন্য জওহরলাল নেহরু নগর পুনর্নবীকরণ মিশন এবং রাজীব আবাস যোজনায় বিপুল অর্থ খরচ করা হয়েছে। সমীক্ষার প্রশ্নাবলি চূড়ান্ত এবং গ্রহণীয় নথিপত্রের তালিকা প্রস্তুত করতে আয়োজন করা হয়েছে বৈঠকের। শুরু হয়েছে সমীক্ষা। কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে কোনও শহরেই শেষপর্যন্ত নথিপত্রের তালিকা ও পদ্ধতি চূড়ান্ত করে ওঠা সম্ভব হয়নি।

বাড়ির জন্য টাকা জোগাড়ের সামর্থ্য

যোগ্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল টাকা জোগাড়ের সামর্থ্য। দীপক পারেখ কমিটি বিষয়টিকে অত্যন্ত খোলামেলাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কমিটির মত অনুযায়ী, ঋণ শোধের মাসিক কিস্তি হিসাবে প্রতিটি পরিবারকে ৩ হাজার টাকার কাছাকাছি দিতে হবে। বহু সমালোচিত ৩২ টাকা প্রাত্যহিক আয়কে দারিদ্রসীমা হিসাবে ধরে তাকে ভোগ্যপণ্যের মূল্য সূচক দিয়ে গণনা করলে দিল্লি শহরে দারিদ্রসীমায় থাকা একটি পরিবারের মাসিক গড় আয় দাঁড়ায় ৬৫০০ টাকা। ছোট শহরগুলির ক্ষেত্রে এই পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৮০০ থেকে ৬০০০ টাকা। এই আয়ে কোনওভাবেই সচ্ছলতা আসে না, কিন্তু আজও শহরের ২০ শতাংশ

পরিবারের আর্থিক অবস্থা এমনই। যাঁদের প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা ঋণ শোধের ক্ষমতা আছে তাঁরা নন, এই প্রান্তিক পরিবারগুলির ওপরেই মিশনের আওতায় সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত।

হিসাবে এটা স্পষ্ট যে, প্রকৃত দরিদ্র পরিবারগুলি আবাসন ঋণ পরিশোধের মাসিক কিস্তি দিতে অপারগ। NSS-এর ২০০৯-১০ সালের ভোগব্যয় সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, শহুরে পরিবারগুলির মধ্যে দরিদ্রতম ৩০ শতাংশের মাসে ৮৫০ টাকার বেশি দেবার ক্ষমতা নেই। খাবার ছাড়া অন্যান্য খাতে তাঁরা যে খরচ করেন, টাকায় এই অঙ্কটা তার প্রায় সমান। আজকের হিসেবে তা বড়জোর এক হাজার টাকা হতে পারে। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের মাসিক কিস্তি ২৮০০ থেকে ৩০০০ টাকা ধার্য হলে দরিদ্রতম মানুষজন এর সুবিধা নিতে পারবেন না। আবার জমির দাম সরকার দিয়ে দিলেও ১০০০ টাকা মাসিক কিস্তিতে কোনও বড় শহরে বাড়ির মালিকানা পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে রাজীব আবাস যোজনার আওতায় থাকা ঘরগুলির আয়তন কমিয়ে ১২০ বর্গফুট করা যেতে পারে। আয়তন ১৮০ বর্গফুটে রাখতে হলে অতিরিক্ত ভরতুকির প্রয়োজন।

JNNURM শহরগুলিতে বর্জনমুখী নগরায়ণ

যে ৬৫টি বড় শহরে জওহরলাল নেহরু নগর পুনর্নবীকরণ মিশন রূপায়িত হয়েছে, লক্ষ করলে দেখা যাবে—

(ক) ২০১১ সালের জনগণনা ও National Sample Survey-র তথ্য অনুসারে সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে,

(খ) শহর এলাকায় বস্তিবাসীর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

এর কারণ হল বস্তি উচ্ছেদ করে সেগুলি শহরের প্রান্তসীমায় পাঠানো। যে বস্তিগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, যেখানে জীবনধারণের মৌলিক সুবিধাগুলিও নেই, সেগুলি ভেঙে দিলে জীবনধারণের মান বাড়ে, আরও বেশি মানুষের কাছে জীবনের ন্যূনতম সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়া যায়।

জনগোষ্ঠীগত সব মাপকাঠিতেই JNNURM বর্জনমুখী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর আওতায় থাকা শহরগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও দারিদ্র কমেছে। তবে এইসব স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে নিম্নমুখী প্রবণতার কারণ জন্মহার হ্রাস নয়। অন্যান্য এলাকা থেকে এইসব স্থানে অভিবাসীর সংখ্যা কমেছে। দশ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার যেসব শহর এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে, সেখানে দরিদ্রের হার যে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, NSS-এর পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ।

রাজীব আবাস যোজনা কার্যকর করার পরিপ্রেক্ষিত

পরিকল্পনাকারী ও প্রশাসকরা মনে করেন, বড় শহরের তুলনায় ছোট ও মাঝারি শহরগুলিতে পরিকাঠামোগত ঘাটতি বিপুল। জীবনধারণের মৌলিক সুবিধাগুলি পাননি, এমন মানুষের সংখ্যাও সেখানে অনেক বেশি। এই শহরগুলির বিদ্যুৎ, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নয়নে তাঁদের তাই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। ছোট ও মাঝারি শহরগুলির মৌলিক সুযোগসুবিধা বাড়াতে অবিলম্বে JNNURM-এর ধাঁচে আর একটি মিশন চালু করা উচিত। ২০১১ সালের জনগণনায় ২৮০০টি এমন নতুন শহরকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে অকৃষিক্ষেত্রের বিকাশ লক্ষ করা গেছে এবং যাদের অর্থনীতিতে বহুমুখীকরণের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু পরিকাঠামোগত সহায়তা না থাকলে এগুলি অন্য শহরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। ভবিষ্যতের বিকাশ কেন্দ্রে পরিণত হওয়া তো দূরে থাক, শহুরে চালচিত্র থেকেই এগুলি উধাও হয়ে যাবে।

রাজীব আবাস যোজনার পরিকল্পনা ও রূপায়ণে এই ভিন্নতার কারণে জাতীয় ও শহরস্তরের পরিকল্পকদের মধ্যে সমন্বয়ের একটা অভাব থেকে যাচ্ছে বলে মনে হয়। কোনও না কোনও অজুহাতে স্থানীয় জমিমালিক সংস্থাগুলি বস্তির জমি সরকারকে দিতে চাইছে না। অন্যদিকে বস্তিবাসীরাও চাইছেন না শহরের বাইরে বসবাস করতে। এই বাস্তব পরিস্থিতিতে বস্তিমুক্ত ভারতের স্বপ্ন রূপায়ণ প্রায় অসম্ভবই থেকে যাচ্ছে। অথচ ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ জমি পাওয়া গেলেও তার ওপর দু-তিনতলা বাড়ি বানিয়ে বর্তমানে যত মানুষ বস্তিতে থাকেন, তার ২ থেকে ৩ গুণ বেশি লোককে সেখানে রাখা যেত।

পারস্পরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে বস্তিবাসীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকা উচিত। জেনে নেওয়া প্রয়োজন তাঁদের চাহিদা ও সামর্থ্য। সরকারি ভরতুকি এক্ষেত্রে অপরিহার্য। বড় শহরগুলিতে, যেখানে জমি দুষ্প্রাপ্য, সেখানে বেসরকারি নির্মাণকারীদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তবে দরিদ্র মানুষের জন্য বাড়ি তৈরির নামে তাঁরা যাতে বহুতল ভবন নির্মাণ করে বাজারে বেচে না দেন, তার ওপর নজর রাখাও দরকার। রাজীব আবাস যোজনার দুটি মূলগত উপাদান আছে। এর একটি হল আবাসন এবং অপরটি পরিকাঠামো ও মৌলিক সুযোগসুবিধা। জওহরলাল নেহরু নগর পুনর্নবীকরণ মিশনে দুর্ভাগ্যবশত এই দুটি উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি এবং দরিদ্র মানুষের জন্য মৌলিক সুবিধাদানের কর্মসূচিটি বহুতল আবাসন নির্মাণে পর্যবসিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এইসব আবাসনের মালিকানা অর্জন করা দরিদ্র মানুষের আয়ত্তের বাইরে ছিল। সম্পদের সীমাবদ্ধতায় এই ধরনের বেশি আবাসন গড়েও তোলা যায়নি।

আমরা মনে করি, বস্তিবাসীদের মাথার ওপর ছাদের সংস্থানে একটি আন্তরিক উদ্যোগ অবশ্যই নেওয়া উচিত, এই মিশনের জন্য বিনামূল্যে জমি দেওয়া উচিত, বাড়ির মূল্যের ওপর সরকারের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভরতুকি দেওয়া দরকার এবং সর্বোপরি বাড়ির আয়তন ১৮০ থেকে ২০০ বর্গমিটারের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে দরিদ্র মানুষজনের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য থাকে।❑

[লেখক অমিতাভ কুন্ডু জার্মানির উয়ের্জবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক, ভারতের দিল্লি পলিসি গ্রুপের সিনিয়র ফেলো এবং নতুন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ বিজিওনাল ডেভেলপমেন্টের অধ্যাপক]

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

স্মার্ট শহরের পরিকল্পনা

কেন্দ্রের নতুন সরকার প্রথম বাজেটে ১০০টি স্মার্ট শহর গড়ার কথা ঘোষণা করেছে। স্মার্ট বলতে কী বোঝায় তার একটা ধারণা আছে এই নিবন্ধে। চ্যালেঞ্জ উতরে স্মার্ট শহর গড়ার পরিকল্পনা সফল করার দিশাও বাতলানো হয়েছে। শুধু ১০০টি শহর নয়, সবার কল্যাণে শহরগ্রাম নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি জনপদকে আরও স্মার্ট করে তোলার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন দুই লেখক **এস. চন্দ্রশেখর** ও **নীহারিকা ভেঙ্কটেশ।**

স্মার্ট শহরের পরিকল্পনা—নয়া সরকারের উন্নয়ন মডেলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবার বাজেটে একশো স্মার্ট শহরের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বরাদ্দ করেছেন ৭০৬০ কোটি টাকা। তার কথা, বৃহৎ শহরগুলির উপনগরী রূপে ও মাঝারি শহরগুলি আধুনিক কেতাদুরস্ত করে এই একশো স্মার্ট শহর গড়ে তোলা হবে।

বাজেটে এ বাবদ খরচপাতির একটা মোট হিসাব ও কতদিনে কাজ সম্পন্ন হবে জানালে ভালো হত। বোঝা যেত এজন্য বরাদ্দ টাকা-কড়ি যথেষ্ট কী না। স্মার্ট শহর তৈরির জন্য লগ্নির পরিমাণ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণার অভাব, বাজেটের এই গলতির হেতু হতে পারে।

শুধু ভারত নয়, স্মার্ট সিটি নিয়ে মাতামাতি বিশ্ব জুড়ে। মুশকিল হল, স্মার্ট শহরের কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। কীভাবে একটা স্মার্ট শহরকে শনাক্ত করা যাবে। কী তার আইডেনটিটি বা নিদর্শন। আসলে স্মার্ট সিটি নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত গাদাগুচ্ছের তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে। সৃজনশীল (ক্রিয়েটিভ), ডিজিটাল, ই-গভর্নড, অনট্রাপ্রানাল, ইনটেলিজেন্ট, জ্ঞান (নলেজ) ইত্যাদি। এহেন সব তত্ত্বই কাজে লাগায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে (ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনলজি—আইসিটি) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এসব তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উন্নয়নের জন্য তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যও (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস—এমডিজি)। বস্তুত, উন্নতির জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অন্যতম টার্গেট হচ্ছে অসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে সহযোগিতা ও হালফিলকার প্রযুক্তি বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কাজে লাগানো। ভারত সরকারের মতে এই অর্জনের পথে দেশ ঠিকঠাক এগোচ্ছে।

জনসাধারণের জন্য স্মার্ট শহরের তাৎপর্য কী তার ব্যাখ্যা নিয়ে নিঃসন্দেহে বিতর্ক দানা বাঁধবে। তবে কিনা গুজরাত ইনটারন্যাশনাল ফিন-টেক সিটির মতো স্মার্ট বিজনেস হাবের বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে তা ঠাহর করা অনেকটা সহজ হবে। আপামর বাসিন্দার জন্য স্মার্ট শহর গড়ে তোলা এক দস্তুরমতো চ্যালেঞ্জ। গরিব-বড়লোক নির্বিশেষে সকলের জন্য এক ইনক্লুসিভ সিটি তৈরি চাট্টিখানি কথা নয়। এটা বলা যুক্তিসংগত যে ভারতের মতো দেশে স্মার্ট সিটি হবে জনসাধারণ-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ স্মার্ট শহর তৈরি করা হবে মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে। এসব শহর যেন অবশ্যই মানুষের কাজে লাগে। সুতরাং, স্মার্ট শহরের এক ব্যবহারোপযোগী সংজ্ঞা দেবার চেয়ে এই নিবন্ধে এ ব্যাপারে এক রোড-ম্যাপ এর খসড়া বা রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের চেয়ে স্মার্ট শহর বা জনপদ-এর তত্ত্বকে একটি প্রক্রিয়া বা কার্যক্রম হিসেবে দেখা ভালো। এই প্রক্রিয়া ক্রমশ এগিয়ে চলে। স্মার্ট শহরের সর্বজনস্বীকৃত একটিমাত্র সংজ্ঞা না থাকার পিছনে আছে এই বৈশিষ্ট্য। তাই স্মার্ট শহর হবে ই-গভর্নড। ডিজাইন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিয়ত উন্নতির জন্য সচেষ্ট। সেখানে থাকবে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নয়নের পরিকল্পনা। জন পরিবহণ (মাস ট্রানজিট) মুখী উন্নয়ন। অটোমেশনের সুবিধা নিতে তৎপর। শহরের বাসিন্দাদের জন্য প্রযুক্তি প্রয়োগে ক্রমাগত উদ্ভাবনা।

কোনও শহর স্মার্ট রূপে গড়ার জন্য প্রথমে চাই জনকেন্দ্রিক প্রযুক্তির বিকাশ। উন্নয়ন বিশেষত স্বচ্ছতা ও দেশশাসন ব্যবস্থার উন্নতির গরজে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কাজে লাগানোর ধারণা আমাদের দেশে আদৌ আনকোরা নয়। স্মার্ট শহর তৈরির পরিকল্পনা এসেছে এই ধারণার হাত ধরে। ভারতে জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স (দেশশাসনে যতবেশি সম্ভব প্রযুক্তির ব্যবস্থা) এর লক্ষ্য—যাবতীয় সরকারি পরিষেবা সাধারণ মানুষের নাগালে এনে দেওয়া এবং দূরে না ছুটে তা যেন তার বাড়ির কাছাকাছি মেলে। মানুষের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের জন্য এসব পরিষেবা হবে দক্ষ, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য। দাম হবে ন্যায্য। ছোট বড় ৯৩৯১টি শহর ও ৬,৪০,৮৬৭টি গ্রামের জন্য ২,৩৮,৬১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিটে ই-গভর্ন্যান্স নিশ্চিত করা যাবে। এজন্য দরকার গ্রামাঞ্চলে ইনটারনেট সংযোগ। 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' উদ্যোগ বাবদ বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা। স্মার্ট জনপদ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে ই-গভর্ন্যান্স হচ্ছে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আর এক্ষেত্রে সরকার ইতিমধ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ।

দেশজুড়ে ই-গভর্ন্যান্সের জাল বিছানো হচ্ছে। তাই শুধুমাত্র ১০০টি স্মার্ট শহর তৈরির দিকে আটকে না থেকে প্রতিটি জনপদকে স্মার্ট করাটা বেশি ঠিক হবে। গোড়ায়, দশ হাজারের বেশি বাসিন্দার ৪,৮৬২টি গ্রামকে স্মার্ট করা যেতে পারে। এর আওতায় পড়বে গ্রামের জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ। পরের ধাপে সরকার নজর দিতে পারে শহরাঞ্চলের কোলঘেঁষা পাঁচ হাজারের বেশি অধিবাসীর গ্রামগুলির দিকে। গ্রামবাসীদের আরও ১৩.২ শতাংশ আসবে এর আওতায়। বড় এবং শহরের কাছাকাছি অধিকাংশ গ্রাম একসময় শহর হয়ে উঠবে। এসব গ্রামকে স্মার্ট করার স্ট্র্যাটেজি যথেষ্ট যুক্তিসংগত। আগে থেকে পরিকল্পনা ছকা তাই একটা স্মার্ট আইডিয়া। দেশশাসন বা গভর্ন্যান্স ও পরিষেবা বিলিবণ্টনের প্রেক্ষিতে এই স্মার্ট গ্রামগুলিকে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ই-

পঞ্চায়েত প্রকল্পের এক্তিয়ারে আনা যেতে পারে। পরিকল্পনা, রূপায়ণ, নজরদারি, বাজেট তৈরি, হিসেবপত্তর, সামাজিক অডিট ও সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ইত্যাদি ইস্যু করার মতো পঞ্চায়েতের যাবতীয় কাজকর্ম এই প্রকল্পে সারা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তিকে এম-হেল্‌থ ও ই-লার্নিং এর মডেল তৈরির কাজে লাগাতে চায়। গ্রামগুলির দিকেও এসব উদ্যোগে নজর দেওয়া উচিত। দিল্লি-মুম্বই শিল্প করিডরের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার দিকটিও মাথায় রাখতে হবে।

এসব প্রস্তাবের মোদ্দা কথা—গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি জনপদ এবং হবু শহরকে আরও স্মার্ট করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগের এক লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। ভাবী নগরায়নের জন্য একে বটম আপ পরিকল্পনা বলে ধরা যায়। বিক্ষিপ্তভাবে গজিয়ে ওঠা শহরের সমস্যা মোকাবিলায় রিঅ্যাকটিভ স্ট্রাটেজি না নিয়ে বিকাশের জন্য পরিকল্পনার লক্ষ্যে এটা আগে থেকে ব্যবস্থা নেবার বা প্রিএমপটিভ স্ট্র্যাটেজি। এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার নেয় রিঅ্যাকটিভ স্ট্র্যাটেজি।

উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি ২০১১-র সেপ্টেম্বরে ইউসুফ মেহেরালি স্মারক বক্তৃতায় শহর শাসন ও পরিষেবা বিলিবণ্টনের উন্নতির ক্ষেত্রে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ নিয়ে তার বক্তব্য পেশ করেন। সেই বক্তৃতার দুটি ইস্যুর সঙ্গে এই নিবন্ধের সম্পর্ক আছে। উপরাষ্ট্রপতির প্রথম পয়েন্টটি ছিল—লগ্নির পরিমাণ ও প্রকল্প বাছাই নিয়ে রাজনৈতিক টানাহ্যাঁচড়া ও অর্থনৈতিক সংঘাত বিদ্যমান। কিছু সমালোচক বলেন আমাদের শহরগুলি উঁচুতলার মানুষ কবজা করে নিয়েছে। শহরের যাবতীয় সাধারণ সুযোগসুবিধা ভোগদখল করছে তারাই। কারও কারও খেদ অন্যদের বঞ্চিত করে শহরায়নের সুফল ভোগ করছে সমাজের কতিপয় গোষ্ঠী। এদের কলকাঠিতে ছোট ও মাঝারি শহরগুলির পরিকাঠামো ও আবশ্যক পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল জুটছে না। সম্পদ বরাদ্দ হচ্ছে বৃহৎ শহরগুলির খাঁই মেটাতে। দ্বিতীয়ত, শহরে পরিষেবার ক্ষেত্রে সংস্কার নিয়ে চলছে চাপানউতোর। একদল সংস্কারের পক্ষে। অন্যপক্ষ আবার এই সংস্কার প্রচেষ্টার বিরোধিতায় সোচ্চার। পুর পরিষেবায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বেসরকারিকরণের পক্ষপাতীরা চায় সরকার নিছক নিয়ামক বা সহায়ক হিসেবে কাজ করুক। এর বিরোধীদের মতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে। সরকারকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে সব শহরবাসীর জন্য মৌল পরিষেবা কীভাবে সুনিশ্চিত করা যায়। শুধু ইদানিংকার পরিষেবার ঘাটতি বা ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করা যথেষ্ট নয়। আগামী দিনে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোরও পরিকল্পনা করা জরুরি। সত্যি বলতে, জওহরলাল নেহরু শহর নবরূপায়ণ প্রকল্প (জেএনইউআরএম) এ শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায় শহরাঞ্চলে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নির্ভরযোগ্য হিসেবপত্তর নেই। স্মার্ট জনপদের ক্ষেত্রে এটা ধর্তব্যের মধ্যে রেখে মৌল পরিষেবা মেলা নিশ্চিত করতে হবে।

২০১১-র আদমশুমারির হিসেবে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার পরিবার বস্তিতে মাথা গুঁজে আছে। অর্থাৎ, শহরাঞ্চলে ১৭ শতাংশ পরিবার বস্তিবাসী। আর খাতায় কলমে বস্তি না হলেও ঝুপড়ির মতো পরিবেশে দিনগুজরানকারীদের ধরলে এ সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। ২০১১ এ বিধিবদ্ধ শহরের সংখ্যা ছিল ৪০৪১। এর মধ্যে ৬৩ শতাংশ শহরে বস্তি আছে। স্মার্ট শহর বলতে চোখে ভেসে ওঠে কেতাদুরস্ত ঝাঁ চকচকে জনপদ। লোকজনে গিজগিজ বস্তি বা বস্তির মতো পরিবেশ তার সঙ্গে একেবারে বেখাপ্পা। ভারতে শহরাঞ্চলে রান্নাবাড়ার জন্য ২৬ শতাংশ পরিবার কয়লা, ঘুঁটে, কাঠকুটো ইত্যাদি জ্বালায়। বায়ুদূষণের একশেষ আর কী। স্মার্ট হতে গেলে সেই শহর বা জনপদকে এহেন ক্ষেত্রে ঠিকঠাক পরিকাঠামো গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া দরকার। একমাত্র তারপর অপচয় ঠেকানো ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল দাম (ডিফারেনশিয়াল প্রাইসিং) চালু করতে প্রযুক্তি সাহায্য করতে পারে। সুতরাং ভারতে শহরাঞ্চলের প্রেক্ষিতে জল, স্যানিটেশন ও ঘরবসতের অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য স্মার্ট চিন্তাভাবনা দরকার। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, পুর পরিষেবার গুণপনার কীভাবে উন্নতি করা যায়।

স্মার্ট সিদ্ধান্ত (ডিসিশন) নেবার জন্য ভালোরকম তথ্যভাণ্ডার থাকা দরকার। ভারতের শহরগুলির ক্ষেত্রে এর একান্ত অভাব। পরিষেবার পরিবর্তনশীল দাম (ডাইন্যামিক প্রাইসিং) অথবা ট্রাফিকের রুটিং এ কোনও স্মার্ট অ্যালগরিদম (algorithms) চালু করা তাই তুড়ি মেরে করা যায় না। উন্নত দেশের শহরে যা কিনা অনেকটা অনায়াসসাধ্য। অবশ্য, এর মানে এ নয় যে স্মার্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নাগরিকদের ক্ষমতা বা অধিকার বাড়ানো অসম্ভব। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রণালী (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস) বিকাশ করে, ছত্তিশগড়ের মতো কিছু রাজ্য সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছে। রায়পুরে মানুষকে তাদের পছন্দসই ন্যায্য মূল্যের দোকান বেছে নিতে দেওয়া হয়েছে। মাত্র একবারের বদলে তারা নিজেদের মর্জিমতো মালপত্তর কিনতে পারে খেপে খেপে। রেশন কার্ড দেখিয়ে যে কোনও ন্যায্য মূল্যের দোকানে তারা সওদা করতে পারে। আগের মতো আর একটি বাধাধরা দোকান থেকে কেনার বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ রেশন কার্ড এখন পোর্টেবল। দেশের অন্যান্য শহর রায়পুর মডেল অনুসরণ করলে বহুনিন্দিত সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। কাজের খোঁজে এক রাজ্য বা শহর থেকে ভিন রাজ্য বা শহরে পাড়ি দেওয়া শ্রমিকদের জন্য পোর্টেবল রেশন কার্ড চালু করা খুবই যুক্তিসংগত হবে। একটু তত্ত্বতালাশ করলে দেখা যাবে এহেন আরও অনেক উদ্যোগ ইতিউতি নেওয়া হয়েছে। স্থায়ীভাবে এসব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং দেশের সব মানুষকে এর আওতায় আনাটা অবশ্য এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। এই প্রক্রিয়ায়, এমনকী একটি আনস্মার্ট এবং নিষ্ক্রিয় শহরও স্মার্ট, দক্ষ, সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারে।❑

[এস চন্দ্রশেখর মুম্বই ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এ অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক। তার গবেষণার চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে ভারতে শহরাঞ্চলের গরিবি, কাজের খোঁজে কর্মীদের স্থানান্তর গমন ও শহরায়ন, শহর-গ্রাম সংযোগ ও শ্রম বাজার। একই প্রতিষ্ঠানে এখন গবেষণা করছেন নীহারিকা বেঙ্কটেশ। খড়গপুর আইআইটি থেকে ইনটিগ্রেটেড এমএসসি (ইনকমিকস)।]

নগর মাঝে গ্রামীণ ইস্যু

গ্রামপ্রধান ভারতে শহর কোনও বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। সাদা ও কালোর মতো শহর এবং গ্রামকে দু'টি চরম ভাগে ভাগ করার দিন কাবার। গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে শহরের। ফলশ্রুতি—নগরজীবনে লক্ষণীয় গ্রামীণ প্রভাব। নিবন্ধটি কেবলমাত্র বেঙ্গালুরুর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছে। দেশের অধিকাংশ শহরের ক্ষেত্রে কিন্তু তা প্রযোজ্য। নগরে সেঁধানো গ্রামীণ ইস্যুর দিকে শহর নীতিতে নজর দেওয়া জরুরি, সওয়াল লিখছেন **নরেন্দর পানি।**

ভারতে নীতি চর্চায় (আলোচনা বিতর্ক, লেখালেখি) শহর ও গ্রামের মধ্যে ভেদাভেদে রং চড়ানোর একটা ঝোঁক আছে। সাতের দশকে ভারতীয় নীতি প্রণেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল শহরের কোলে ঝোল টানার (লিপটন, ১৯৭৭)। পাশার দান উলটে গেছে। ইদানীংকার লেখালেখিতে বরং বলা হচ্ছে গ্রামাঞ্চল নিয়ে নীতি প্রণেতাদের যত মাথাব্যথা (শিবরামকৃষ্ণন, ২০১১)। তবে বিশ্বায়ন মারফত অনুপ্রাণিত হয়ে এ-সংক্রান্ত চর্চায় দেখা যাচ্ছে বিভাজন বা সীমারেখা নিয়ে চরম মনোভাব হয়তো বেবাক সাচ্চা নয়। ডাচ-মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ সাসকিয়া সাশেন-এর মতে এই সীমারেখা মোটামুটি দু'ধরনের। একটি ক্ষেত্রে এই সীমা উৎপন্ন দ্রব্য, ব্যক্তি এবং সাজসরঞ্জামের সঙ্গে যুক্ত। অন্য ক্ষেত্রে এই সীমার অবস্থিতি বহু জায়গায়। (সাশেন, ২০০৬ পৃষ্ঠা ৪১৬)। শহর ও গ্রামের মধ্যে আছে এই দু'ধরনের সীমারেখাই। ভারতের বেশি দ্রুত বেড়ে চলা শহরগুলিতে পাওয়া যায় এর স্পষ্ট ইঙ্গিত। শহরে কাজকামের ধান্দায় আগন্তুক অনেকে তাদের গাঁ-গঞ্জের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলে। শহুরে পরিবেশে দিন কাটালেও তাদের প্রাণেমনে গ্রামের প্রভাব যথেষ্ট পাকাপোক্ত। এভাবে গ্রাম তার সীমানা ছাড়িয়ে ঢুকে পড়ে শহরের অনেক ভিতরে। ভারতে শহরের বাড় ঘটে সমান্তরালভাবে। অর্থাৎ কোলেপিঠের গ্রামগুলিতে তার থাবা বাড়িয়ে। ফলে গ্রাম ও শহর একে অন্যের সীমায় ঢুকে পড়ে। শহর গিলে নিলেও এসব সাবেক গাঁ-গঞ্জে গ্রামীণ সত্তা টিকে থাকে বহুদিন যাবৎ। এরপর গ্রাম মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় শহরের মাঝে। ভারতে শহরে চরিত্র বুঝতে হলে তাই তার মধ্যে গ্রামের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু স্বচ্ছ ধারণা থাকা চাই।

শহরে গ্রামের প্রভাবে দুটি পৃথক সীমারেখারই ভূমিকা আছে। শহরের আত্মসাৎ করা গ্রাম এবং তার আশপাশ জুড়ে শহরোন্নয়ন-এর মধ্যেকার সীমারেখাটি অনেকখানি স্থায়ী। অন্য সীমারেখাটি শহর এবং কিছু দূরের গ্রামগুলির মধ্যে। এই সীমারেখা শহরে পাড়ি জমানো ব্যক্তি ও তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত। নিবন্ধে এ ব্যাপারে টুকিটাকি আলোচনা করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই দেখা যাবে গ্রামাঞ্চলের ঘটনাবলি প্রভাব ফেলে শহরের পরিস্থিতিতে। একটি কার্যকর শহর নীতি গ্রামকে হেলাফেলা করতে পারে না। বহর ছোট রাখার তাগিদে এ নিবন্ধে কেবলমাত্র একটি শহর বেঙ্গালুরুর অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।

শহরের মধ্যে গ্রাম

গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ভারতের সব শহরে একই গতিপ্রকৃতি প্রত্যাশা করাটা অহেতুক। এমনকী, একই শহরের মধ্যেও তার হেরফের হতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের জন্য গৃহীত আর উৎপাদন শিল্পের জন্য নেওয়া গ্রামের ভবিষ্যৎ এক নয়। পোশাক রপ্তানি শিল্পের নিমিত্তে বেঙ্গালুরুতে গ্রামকে শহরের অন্তর্গত করাটা একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। বেঙ্গালুরুর পোশাক-শিল্পে নারী শ্রমিকের ভিড় বেশি। তাদের কারখানা ও ঘরবসতির পরিবেশের মধ্যে আকাশজমিন তারতম্য একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ঝাঁ-চকচকে কারখানার পাশে কোথায় লাগে কর্মীদের হতকুচ্ছিত ঘরদোর। বেঙ্গালুরুর জগৎজোড়া উজ্জ্বল ভাবমূর্তির সঙ্গে যা কিনা একেবারে বেমানান। ২০০৯-এ বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ এই নারী-শ্রমিকদের বাড়িঘর নিয়ে সমীক্ষা চালায়। সারণিটিতে সেই সমীক্ষার ফল তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি

ভাড়া বাড়িতে থাকা পরিবার	৮৭.৫
খোলা বা তার মতো খেলো মালপত্র দিয়ে তৈরি ছাদের বাড়ি	৬৪.৮
কারখানার দু' কিলোমিটারের মধ্যে আবাস	৭৮.২
ঘরপিছু দুই বা তার বেশি লোকের পরিবার (হেঁশেল সমেত)	৮১.৫
ঘরপিছু তিন বা তার বেশি লোকের পরিবার (হেঁশেল ধরে)	৩১.৪
পরিবারের নিজস্ব শৌচাগার নেই	৭৬.১
বারোয়ারি জলের কলের উপর নির্ভরশীল পরিবার	৭৩.০

★ সব সংখ্যা শতাংশে

নারী-শ্রমিকদের রোজগার গরিবিরেখার উপরে। তার মানে অবশ্য রোজগারপাতি আহামরি বা খুব বেশি নয়। নিজের ঘরদোর নেই অধিকাংশ পরিবারের। অগত্যা ভরসা ভাড়া বাড়ি। এই শিল্পে শ্রমিকরা হরবখত কারখানা ছাড়ে আর ধরে। বেঙ্গালুরুতে বাস, অটোরিকশার ভাড়া বেশ চড়া। বেশিরভাগ শ্রমিক কাজে যায় হেঁটে। কাজে কাজেই, কাজ পালটালে হেঁটে যাবার জন্য কারখানার ধারে-কাছে ঘর বদলাতে হয়। খাপরা বা ওই ধরনের খেলো ছাদের সস্তা ভাড়ার ঘরে ঠাঁই নেয় অধিকাংশ শ্রমিক। সস্তার তিন অবস্থা। এসব জায়গায় বারোয়ারি জলের কল আর শৌচাগারে কাজ সারতে হয়। এইটুকু এইটুকু ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে থাকা কল্পনাবিলাস বই আর কিছু নয়। পাঁচ ভাগের মধ্যে চার ভাগ পরিবার এসব ঘুপচি ঘরে দু'জনের বেশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কাটায়। আর ৩১ শতাংশে থাকে ঘরপিছু তিনজনের বেশি। শহরে জমিবাড়ির দাম গলাকাটা। এ সত্ত্বেও এত কম ভাড়ায় ঘর মিলছে। বেঙ্গালুরুতে সৃষ্টিছাড়াভাবে গ্রামের পর গ্রাম শহরে অন্তর্ভুক্তির ফলেই এটা সম্ভব। সাত ও আটের দশকে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে এক সরকারি মূল্যায়নের মতে দুটি আইনে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। কর্নাটক শিল্পাঞ্চল উন্নয়ন আইন, ১৯৬৬ ও ব্যাঙ্গালোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৭৬। এই দুই আইনে জমি দখলের জন্য নিয়মকানুন চালু করা হয় (রবীন্দ্র ও অন্যান্য, ১৯৮৯)। কর্নাটক শিল্পাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের ফলে চাষের জমি নিয়ে বেসরকারি শিল্পের হাতে তুলে দেওয়া অনেক সহজ হয়েছে। আর আবাসনের জন্য জমি অধিগ্রহণের দায়িত্ব ব্যাঙ্গালোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের। কর্তৃপক্ষ কম দামে জমি কিনে তা চড়ামূল্যে বিক্রি করেছে। পরে সেই জমি ফের হাতবদল হয়েছে আকাশছোঁয়া দামে। কৃষিজমি অধিগ্রহণের ফলে বেঙ্গালুরুতে অন্তর্ভুক্ত গ্রামের অর্থনৈতিক চরিত্র দ্রুত বদলে যায়। চাষবাসের কাজ রাতারাতি খতম।

অবশ্য গ্রামগুলির সকলে একই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি, এটা বোঝা দরকার। ভূমিহীন আর জোতদারদের অবস্থা এক ছিল না। চাষ বন্ধ হওয়ায় জমিজিরেতহীন কৃষি-শ্রমিক শহরে অন্য কাজের ধান্ধায় নেমে পড়তে বাধ্য হয়। আর ক্ষতিপূরণ? জমি মালিকরা পেলেও তাদের ভাগ্যে জোটেনি। গোল্ডম্যানের কথায়—ভূম্যধিকারী ও ভূমিহীন এই অপরিবর্তনীয় দু ভাগে গ্রামবাসীদের ভাগ করা, বড়সড় শহর প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের দরুন একমাত্র ভূম্যধিকারীর ক্ষতিপূরণ মেলার অধিকার গ্রামের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবিকা আরও ক্ষুণ্ণ করেছে (গোল্ডম্যান ২০১১, পৃষ্ঠা ৫৬৮)।

দু-একজন বড় জোতদারকে ছেড়ে দিলে বেঙ্গালুরুর আশপাশের গ্রামে ছোটখাট জমির মালিকরা ছিল সংখ্যায় ঢের বেশি। ভূমিহীনরা নয় (পানি, ১৯৮৩)। অধিগ্রহণবাবদ ক্ষতিপূরণ পাওয়া চাষির সংখ্যা তাই যথেষ্ট। বেঙ্গালুরুর গ্রাসে যাওয়া গ্রামগুলির অধিকাংশ জমিজিরেত হারা মানুষ আচমকা চাষবাস ছেড়ে ভিন পেশা খুঁজে নেবার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।

অনেকে গাড়ি চালানো শেখা শুরু করে। কেউবা উদ্যোগী হয় বাপ-ঠাকুরদার আমলের ডেয়ারি ব্যবসা আরও একটু বড় করে চালানোর জন্য। ক্ষতিপূরণবাবদ পাওয়া সামান্য কটি টাকা চলে যায় এসবের পিছনে। গাঁ-ঘরে পড়ে থাকা একটু ভিটে জমি তাদের কাছে হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। গ্রামে ঘরবাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে মানুষকে নিয়মকানুনের তেমন কড়াকড়ি মানতে হয়নি। বেঙ্গালুরুর অন্তর্ভুক্ত এসব সাবেক গ্রামেও কম খরচে গজিয়ে উঠল ঘিঞ্জি ঘরদোর। গরিবগুর্বোরা ঠাঁই নিল সেখানে। অনেক সময় এসব ঘরবাড়ি তৈরিতে আইনকানুনের কোনও তোয়াক্কা করা হয়নি। ব্যাঙ্গালোরে আধা জমির কোনও হিসেব নেই পুর নিগমের ট্যাক্স রেকর্ডে (লক্ষ্মী শ্রীনিবাস ১৯৯১)।

এসব গ্রাম বেঙ্গালুরুর অন্তর্গত করার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া প্রায়ই সোজাসাপটা নয়। মায়, পরিবর্তনের পরেও গ্রামীণ প্রভাবের রেশ বহাল থেকে যায়। শহরের গ্রাস থেকে বেঁচে যাওয়া জমিজমা মূলত আগেকার জোতদার গোষ্ঠীর হাতে। দীনদুঃখীদের জন্য যেমন তেমন ঘরবাড়ি তৈরিতে মওকা এই গোষ্ঠীরই। সরকারি অনুমতি জোগাড়যন্তর বা অনুমতি না মিললে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মীদের চোখ বুজিয়ে রাখার কায়দা তাদের বেশ জানা। এতে, মোদ্দা কথায় এসব গোষ্ঠী ও রাজনীতির উঠতি মাতব্বরদের মধ্যে যোগসাজশ বা দহরমের পথও খোলসা হয়।

শহর থেকে দূরের গ্রাম

কিছু ক্ষেত্রে শহরে নারী-শ্রমিকের পরিবার আগের মতো গ্রামের শরিকি জমি থেকে স্বামীর হিস্যার খাদ্যশস্য পেতে থাকে। নারী-শ্রমিকের পোশাকআশাকেও গ্রাম ও শহর দুয়ের ছাপও ফুটে ওঠে। কিছু পোশাকের বেলায় অবশ্য খাটে না একথা। যেমন নাইটগাউন বা শয়নবাস। শহরে দিনের অনেকটা সময় এটা পরেই কাটিয়ে দেয় এদের কেউ কেউ। গ্রামে হয়তো সেটা সম্ভব হত না। ব্যক্তির মাধ্যমে গ্রামে শহরের প্রভাব এবং শহরে গ্রামের প্রভাব এর মাত্রা নির্ভর করে এই পারস্পরিক ক্রিয়া মারফত। বলা হয় যে, গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি জমানো প্রাথমিক ভিত্তির ভূমিকা পালন করে শহরাঞ্চলের ঘরবসতি। গ্রামের কোনও লোক বা পরিবার হয়তো শহরে উঠে গেছে। শহরে ঠাঁই নিতে স্বগ্রামের অন্য কেউ কেউ সেখানে আপাতত আস্তানা গাড়ে। একটু থিতু হলে তারাই পরে আবার টেনে নিয়ে আসে অন্যদের। 'সমষ্টিগত বা জোটবদ্ধ পরিবার' আখ্যাটির আওতায় আসে সেই পরিবার যার লোকজন একই মা-বাপের সন্তান নয় (পানি ও অন্যান্য ২০১০)। এই সংজ্ঞা মাফিক বেঙ্গালুরুতে পোশাক-শিল্পের নারী কর্মীদের ৪০ শতাংশের মতো পরিবার জোটবদ্ধ বা সমষ্টিগত। নিকট আত্মীয়স্বজন ছাড়াও দূর সম্পর্কে বা কিছু ক্ষেত্রে নিছক এক গ্রামের এই সূত্রে লোকজন এই পরিবারভুক্ত হয়।

জোটবদ্ধ পরিবার গ্রাম ও শহরের মধ্যে সংযোগেরও স্পষ্ট লক্ষণ মেলে ধরে। তবে মাইগ্রেশন বা ঠাঁইনাড়া না হয়েও এই যোগসূত্র প্রবল হতে পারে। শহরে কর্মরতা মায়েরা অনেক সময় সন্তান ছেলেবেলা পার হলে রেখে আসে গ্রামের বাড়িতে। শহর ও গ্রামের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের এ এক বড় নিদর্শন। ২০০৯ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব

অ্যাডভান্সড স্টাডিজ এক সমীক্ষা চালায়। দেখা যায় বেঙ্গালুরুর পোশাক-শিল্পের মহিলা কর্মীদের ১৫ বছরের কম বয়সের ২২.৫ শতাংশ ছেলেমেয়ে মায়ের সঙ্গে থাকে না। তারা মানুষ হয় গ্রামে। এটা বুঝতে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই যে ছেলেমেয়েদের দেখতে মহিলা কর্মীরা প্রায়ই গ্রাম থেকে ঘুরে আসে।

ইনস্টিটিউটের এই সমীক্ষা থেকে কিছু তথ্যে তাজ্জব মানতে হয়। ছেলেমেয়ে গ্রামে রেখে আসার পিছনে কিছু কারণ আপাতদৃষ্টিতে মামুলি। সমীক্ষায় দেখা গেছে এর মধ্যে কয়েকটি কারণ কিন্তু মায়েদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ধরা হয়, বাচ্চাকে গ্রামে পাঠাবার সিদ্ধান্তে শহরে কর্মরতা মায়েদের আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা জোর প্রভাব ফেলে। সমীক্ষায় অবশ্য এ ধারণার সমর্থন মেলেনি। এগুলি মূল কারণ নয়। শহরে মহিলা কর্মীদের বেহাল ঘরদোর বা জলের টানাটানিও তাই। বাচ্চার বয়স, মায়ের বয়স, বেঙ্গালুরুতে মা কতদিন আছে, কারখানা থেকে থাকার জায়গা কতটা দূর এগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। সেইসঙ্গে আছে শৌচাগার, ধর্ম, জাতপাত, মাতৃভাষা ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে বাচ্চা ও মায়ের বয়স খুব বড় ভূমিকা নেয়। পাঁচ বছর বা তার কমবয়সি ৩৪ শতাংশ শিশু মায়ের সঙ্গে থাকে না। এগারো থেকে পনেরো বছর বয়সের বাচ্চাদের বেলায় এটা নেমে আসে মাত্র ১৪ শতাংশে। মায়েদের বয়সের ক্ষেত্রেও অবস্থা তথৈবচ। কুড়ি বা তার কম বয়সের মহিলা কর্মীদের ৪০ শতাংশ বাচ্চা মায়ের কাছে থাকে না। বেশি বয়সের মায়েদের ক্ষেত্রে এই শতাংশ আনুপাতিকভাবে নেমে যায়। চল্লিশের বেশি বয়সের মহিলা কর্মীর মাত্র ৪ শতাংশ শিশু মা ছাড়া থাকে। এ থেকে বোঝা যায় বেঙ্গালুরুতে নগরজীবনের অনিশ্চয়তা সামলাতে কমবয়সি মায়ের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তার গ্রামের পরিবার।

গ্রাম থেকে শহরে ঠাঁইনাড়া হওয়ার পর গোড়ার দিকে কিছু ঝঞ্ঝাটের দরুন অনশ্চিয়তার মুখে পড়তে হয়। বেঙ্গালুরুতে ক'বছর আছে—এটা বাচ্চা গ্রামে রেখে দিয়ে আসার সিদ্ধান্তে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। শহরে এক বছর বা তার কম দিনের বাসিন্দা মহিলা কর্মীদের ৫০ শতাংশ বাচ্চা মায়ের সঙ্গে থাকে না। পাঁচ থেকে দশ বছর বেঙ্গালুরুতে কাল কাটানো মায়েদের বেলায় ছেলেমেয়ে কাছে থাকে না মাত্র ১৬ শতাংশ। মা বেশি বছর শহরে থাকলে বাচ্চাকে গাঁয়ে পাঠানোর আর দরকার মনে করে না।

এমন নয়, নগরজীবনের প্রতিটি সমস্যা মায়ের সিদ্ধান্তে একই প্রভাব ফেলে। ঘরে জলের কল থাকা না থাকাটা তেমন একটা পাত্তা পায় না এবেলায়। কারণ, গ্রামে থাকার সময়েও মহিলার এ সুবিধা মেলেনি হয়তো। ঘরে লাগোয়া শৌচাগারের গুরুত্ব অবশ্য এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। বাইরের বারোয়ারি শৌচাগারে রাতবিরেতে বাচ্চা নিয়ে যাবার হ্যাপা এড়াতে মা তাকে গ্রামে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

শহরে কর্মরতা মায়ের পক্ষে গ্রামে পারিবারিক বাড়ি থেকে সাহায্য মেলার ইতরবিশেষ আছে। কোনও কোনও সামাজিক গোষ্ঠী খুব দরাজ। কিছু গোষ্ঠী ততটা উদারমনা নয়। আবার কোনও গোষ্ঠী হয়তো বড় সংকীর্ণচিত্ত। অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর তুলনায় হিন্দুরা সাহায্য করার বিষয়ে ঢের এগিয়ে। আবার হিন্দুদের মধ্যেও বেশ রকমফের আছে বইকী। মা শহরে ভালোভাবে থিতু হওয়া ইস্তক তার বাচ্চাকে গ্রামে মানুষ করার দায়িত্ব নেবার সম্বল তপশিলি জাতির কম থাকতে পারে। গ্রামে জাতপাতের শ্রেণি কাঠামো শহর বেঙ্গালুরুতে জীবনযাত্রার ধাঁচকে প্রভাবিত করছে—এটা তার এক দৃষ্টান্ত।

বেঙ্গালুরুতে গ্রামের প্রভাব সুতরাং বহুমাত্রিক। ভারতে বেশিরভাগ শহরের ক্ষেত্রেও একথা অবশ্যই খাটে। শহরের ভৌগোলিক সীমার অন্তর্গত অঞ্চল থেকে এ প্রভাব পড়তে পারে। আবার খানিকটা দূরের গ্রাম থেকেও। এক কার্যকর শহর নীতিতে তাই নগরাঞ্চলে গ্রামীণ সমস্যাগুলির কিনারা করা জরুরি।❑

[লেখক অধ্যাপক নরেন্দর পানি বেঙ্গাঁলুরুর ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজের অধ্যাপক। খ্যাতানাম অর্থনীতিবিদ।]

ভারতের নগর নীতি

অতীতাবলোকনে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ

নগরোন্নয়ন নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন গোড়া থেকেই নানা চিন্তাভাবনা, নানা প্রকল্প গ্রহণ করছে। কোথাও কোথাও অল্পবিস্তর তফাত ঘটলেও বড় শহর, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য বিবিধ সমস্যা মোটামুটি একই জায়গায় থেকে গেছে। সমাধান করা আজও সম্ভব হয়নি। এর কারণ একাধিক—কিছু প্রশাসনিক, কিছু অর্থকরী এবং কিছু ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংস্থার অপর্যাপ্ত ক্ষমতায়ন। একটি সর্বাঙ্গীণ চিত্র তুলে ধরছেন **আর বি ভগৎ।**

ভূমিকা

উদারীকরণ নীতি গ্রহণের পর থেকে ভারতের আর্থিক উন্নয়নে নগর ও নগরকেন্দ্রের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। উদাহরণ হিসেবে জিডিপি-র কথাই ধরা যাক। ১৯৫০-৫১-এর জিডিপি-তে নগর এলাকার অবদান ছিল ২৯ শতাংশ। ১৯৮১ ও ২০০৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ৪৭ শতাংশ ও ৬৩ শতাংশ। এ থেকে এটুকু আন্দাজ করাই যায় যে ২০২১ সালের মধ্যে জিডিপি-তে নগরাঞ্চলের অংশ ও অবদান বেড়ে দাঁড়াবে ৭৫ শতাংশ (যোজনা কমিশন ২০০৮ : ৩৯৪)। জোরের সঙ্গে এ কথাও বলা হচ্ছে যে শহরগুলিকে কেবলমাত্র আরও বাসযোগ্য ও সর্বাত্মক করে তুলতে পারলেই জিডিপি-র ৯ থেকে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

জাতপাত এবং ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করে জনতাকে প্রভাবিত করবার যে রীতি ভারতে চিরকাল চলে এসেছে তাতে বাদ সেধেছে নগরায়ণ। এখন উন্নয়ন আনার নিজস্ব অধিকারবোধ থেকে সমস্যার সমাধান করার দিকে ঝুঁকছেন মানুষ। একেবারে নগরীয় ধাঁচে পরিবর্তিত হয়েছে নীতি ও শাসন কৌশল। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে দেওয়া গেছে নির্দিষ্ট কিছু অধিকার যার ফলে তাদের হাতে এসেছে ক্ষমতা। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বিরাট এক ব্যবধান এসেছে। ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে গ্রামের মানুষ। নিজেদের আর মেলাতে পারছে না শহরের বাসিন্দাদের সঙ্গে এবং এর জন্য সরকারকেই দায়ী করছে তারা।

তবে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য হচ্ছে এই যে বিভিন্ন নগরনীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করা ভারতের শহরগুলি নিজের মতো করেই গড়ে, বেড়ে উঠেছে। বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির কিছুটা প্রভাব হয়তো পড়েছে বড় নগরগুলির উপরে। তবে ছোট ছোট শহরগুলি বরাবরই এই সমস্ত নীতির নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। বেড়ে উঠেছে আপনা-আপনিই—অতীতে এবং এখনও। ভারতের নগরোন্নয়ন—ইতিহাস থেকেও সেই কথাই স্পষ্ট। এই প্রবন্ধে তাই নগরনীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার এক সম্ভাব্য পথনির্দেশও দেওয়া হয়েছে শেষে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : নগরোন্নয়নের নকশা এবং কর্মসূচি

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এই সময়েই তৈরি হয় শহর ও গ্রাম পরিকল্পনা সংগঠন, জাতীয় নির্মাণ সংস্থা এবং দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি। দিল্লির নগর পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে দিল্লি মূল পরিকল্পনা (Delhi Master Plan) তৈরির প্রচেষ্টাও এই সময়েই। পরে, এই মূল পরিকল্পনার ধাঁচে অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও বিভিন্ন শহর পরিকল্পনা করা হয়। শহর ও গ্রাম পরিকল্পনার আইনগুলি রাজ্যস্তরে প্রয়োগ করার পরামর্শও দেওয়া হয়।

ভারতের নগরোন্নয়ন ও পরিকল্পনার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ হল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাল অর্থাৎ ১৯৬১-১৯৬৬ সাল। ভারসাম্যযুক্ত আঞ্চলিক বিকাশের জন্য শহর ও জনপদের গুরুত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলভিত্তিক নগরোন্নয়ন পরিকল্পনার সুপারিশও করা হয় সেই সময়েই। শহরের জমি ও তার দাম নিয়ন্ত্রণ যে বিশেষ প্রয়োজন তাও জোর দিয়ে বলা হয়। সেই সঙ্গেই উল্লেখ করা হয় বড় শহরগুলির জন্য 'মাস্টার প্ল্যান' তৈরির দায়িত্ব রাজ্য ও স্থানীয় সরকারের। পৌরপ্রশাসনকে জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা এবং শিল্পাঞ্চলগুলিকে শহরের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের থেকে বেশ দূরে গড়ে তোলা উচিত (http://planningcommission.gov.in/plans/planrel/fiveyr/index6.html)। এই সময়েই বেশিরভাগ রাজ্যে নগরোন্নয়ন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন শুরু হয়। আদর্শ হিসেবে ধরে নেওয়া হয় ব্রিটেনের নগর পরিকল্পনার নকশা এবং তার প্রয়োগপন্থাগুলি। এক কথায় এই তৃতীয় পরিকল্পনাকে ভারতের নগরোন্নয়ন নীতি নির্ধারণের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। হয়তো তাই,

তৃতীয় পরিকল্পনায় নেওয়া নগরোন্নয়ন এবং এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের উদ্যোগগুলির উপরেই আবারও জোর দেওয়া হয় চতুর্থ পরিকল্পনাতেও (১৯৬৯-৭৪)। তারই সঙ্গে নেওয়া হয় ৭২টি নগরকেন্দ্র উন্নয়নের পরিকল্পনা। দিল্লি, বৃহত্তর মুম্বই এবং কলকাতার আশপাশের মহানগর এলাকাগুলির ওপর ভিত্তি করে গবেষণার কাজে হাত দেওয়া হয় (http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/4th/4planch19.html)। কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ অর্থ বরাদ্দের সাহায্যে চণ্ডীগড়, গান্ধীনগর, ভূপাল এবং ভুবনেশ্বরের মতো বিভিন্ন রাজ্যের নতুন রাজধানীগুলির উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করা হয়। জোর দেওয়া হয় নগরোন্নয়নের আইনগুলিকে উন্নত করার ব্যাপারেও। বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয় উন্নয়নের কাজে বাধাদানকারী সংবিধিগুলি নিয়ে পর্যালোচনায় বসতে। পঞ্চম পরিকল্পনার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় শহরের জমি (ঊর্ধ্বসীমার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের কথা। ১৯৭৬ সালে এই আইনটি পাশ করা হয়, পঞ্চম পরিকল্পনার সময়কালেই। মহানগরগুলির আশপাশে যে সব ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা গজিয়ে উঠেছিল সেগুলির কথা ভেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয় 'মহানগর পরিকল্পনা অঞ্চল' গঠনে। এই পর্যায়েই মহারাষ্ট্র সরকার দুটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়। প্রথমে, ১৯৭৪ সালে পাশ হয় মুম্বই মহানগর উন্নয়ন আইন এবং এই আইন অনুযায়ী, ১৯৭৫ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে গঠন করা হয় মুম্বই মহানগর অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Mumbai Metropolitan Region Development Authority)। আবাসন ও নগরোন্নয়ন নিগম (হাডকো)-এর স্থাপনাও এই পর্যায়েই। মহানগর এবং জাতীয় গুরুত্বের শহরগুলির জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি ছিল চতুর্থ পরিকল্পনায়। পঞ্চম পরিকল্পনাতেও (১৯৭৪-১৯৭৯) একই ধারা বজায় থাকে। সংহত নগরোন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এনে কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই এবং কয়েকটি জাতীয় গুরুত্বের শহরের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তাই, বলা যায় যে, একের পর এক পরিকল্পনায় শিল্প ও নগরোন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণের মন্ত্র বারবার উচ্চারিত হলেও, পঞ্চম পরিকল্পনা পর্যন্ত কিন্তু তার কোনও লক্ষণ চোখে পড়ে না এবং মূলত বড় শহরগুলির কলাপেই জোটে উন্নয়নের যাবতীয় আশীর্বাদ।

মাঝারি ও ছোট মাপের নগর (১ লাখের কম জনসংখ্যাবিশিষ্ট) ও তার উন্নয়নের ব্যাপারে জোর দেওয়ার কথা প্রথম বলা হয় ষষ্ঠ পরিকল্পনায়। কেন্দ্রীয় সরকার ছোট ও মাঝারি নগর সুসংহত উন্নয়ন (Integrated Development of Small and Medium Towns, IDSMT) প্রকল্প স্থাপন করেন ১৯৭৯ সালে। কিন্তু এই প্রকল্পে ২০০টি এমন শহরের জন্য কেবলমাত্র ৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেই দায় সারা হয়।

সপ্তম পরিকল্পনায় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয় যা এক অর্থে ভবিষ্যৎ ভারতের নগরোন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনার রূপদান করে। নগরায়ণ জাতীয় কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করে আগস্ট ১৯৮৮ সালে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯৮৯ সালে লোকসভায় পেশ হয় ৬৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল। বিলটিতে ত্রিস্তরীয় এক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠন করার কথা বলা হয়। কাঠামোটির উপরের স্তরে থাকবে কেন্দ্র, একেবারে নীচে স্থানীয় নগর সংস্থাগুলি এবং এ দুইয়ের মাঝে রাজ্য। ত্রিস্তরীয় এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় নগর সংস্থাগুলিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার প্রথম প্রচেষ্টাই হল বিলটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রাজ্যগুলির স্বশাসনে হস্তক্ষেপ হতে পারে, শেষমেশ এই আশঙ্কায় কিন্তু রাজ্যসভা বিলটি পাশ হয় না। আবার ১৯৯২ সালে ওই একই বিল ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী বিল হিসাবে পেশ হলে সংসদের দুটি সভাই তা পাশ করে দেয়। ১৯৯৩ সালে কার্যকরী হয় বিলটি।

এবার অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় ১৯৯৩-১৯৯৪ সালের মেগাসিটি প্রকল্পটি ছিল মুম্বই, কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই, এই পাঁচটি মেগাসিটির জন্য। IDSMT প্রকল্পটি ছিল পুনর্নির্মাণ করে তার পরিকাঠামো গঠন কর্মসূচিগুলি একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল রোজগার উৎপাদন ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল, কাজের সন্ধানে বড় শহরের দিকে মানুষের ঢল কিছুটা হলেও ছোট ও মাঝারি শহরগুলির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলির উন্নতির জন্য ছোট এবং মাঝারি শহরগুলিকে বৃদ্ধির উন্নয়নশীল কেন্দ্র হিসাবে দেখা হয়েছিল। বড় শহরের জন্য যেমন 'মাস্টার প্ল্যান' যা ছোট এবং মাঝারি শহরের জন্য তেমনি স্থানীয় পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়। অর্থ জোগানের খামতি মেটাতে বাজেট এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থানের সংস্থান বা বরাদ্দের বাইরে অন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব কি না, খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছিল। (http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/8th/vol2/8v2ch13.htm)।

নবম পরিকল্পনার কালে (১৯৯৭-২০০২) চেষ্টা করে দেখা হয়েছিল কীভাবে সেই সময়ে কার্যকর নগরোন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে একজোট করে গোটা দেশের জন্য এক নগরায়ণ কৌশল ঠিক করা যায়। অষ্টম পরিকল্পনার প্রায় সব কর্মসূচিই চালু রাখা হয়েছিল নবম পরিকল্পনায়। কর্মসূচিগুলির বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় নগর সংস্থাগুলির আর্থিক স্বাবলম্বনের দিকে জোর দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল বাজারভিত্তিক বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি করা। NRY, UBSP এবং PMIUPEP এই পুরোনো কর্মসূচিগুলিকে একত্র করে, ১৯৯৭ সালের ১ ডিসেম্বর, এক নতুন কর্মসূচির জন্ম দেওয়া হয়, নাম রাখা হয় স্বর্ণজয়ন্তী শহরী স্বরোজগার যোজনা (SJSRY)। এতে NRY এবং PMIUPEP-এর স্বরোজগার ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের প্রকল্পগুলিকে নতুনভাবে সাজিয়ে SJSRY-এর মধ্যে দুটি উপপ্রকল্প আনা হয়—(১) নগরভিত্তিক স্বরোজগার প্রকল্প এবং (২) শহরে প্রদেয় মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি। এছাড়া উন্নত বাসস্থান তৈরির জন্য NRY এবং PMIUPEP-এ যে অংশগুলি ছিল, সেগুলি

জুড়ে দিয়ে ১৯৯৭ সালে তৈরি হয় জাতীয় বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচি (National Slum Development Programme, NSDP)। এই কর্মসূচিটি আবার ২০০৫-২০০৬ সালে আর্থিক বছর থেকে বন্ধও করে দেওয়া হয়। আসলে ছোট ও মাঝারি শহরগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল বড়ই কম। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক IDSMT-এর কথা। IDSMT কর্মসূচি, অষ্টম পরিকল্পনার শেষ অবধি, মোট ৯০৪টি শহরের ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল। কিন্তু তার জন্য কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ছিল মাত্র ২৮৩.৯৬ কোটি টাকা (http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/9th/vol2/v2c3-7.htm)। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী প্রায় ৪৫০০টি শহরকেন্দ্রকে ছোট ও মাঝারি শহরের (৩ লাখেরও কম) আওতায় আনা যেতে পারত। কিন্তু বরাদ্দ অর্থ ছিল এতই কম যে তা দিয়ে মাত্র এক পঞ্চমাংশ ছোট ও মাঝারি শহরের দায়িত্বই নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। শেষমেশ তাই এই শহরগুলি দেশের স্থানীয় উন্নয়ন ও নগরায়ণ প্রসারী আদর্শ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়।

দশম পরিকল্পনায় (২০০২-২০০৭) স্বীকার করে নেওয়া হয় যে অর্থনৈতিক উদারীকরণের পরে আশি এবং নব্বই-এর দশকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পেছন রয়েছে নগরায়ণ। আবার একথাও মেনে নেওয়া হয় যে মেগাসিটি প্রকল্প, IDSMT এবং নগরে ত্বরান্বিত জল সরবরাহ কর্মসূচি (Accelerated Urban Water Supply Programme) আংশিক সাফল্যই পেয়েছে। উল্লেখ করা হয় যে কর্মসূচিটির বিসম প্রসার এবং অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের পেছনে কারণ ছিল দুটি, প্রক্রিয়াগত ব্যর্থতা ও সীমিত বাজেট বরাদ্দ। মেগাসিটি এবং IDSMT-এর মতো পরিকাঠামো প্রদান কাজে সহায়ক প্রকল্পগুলি যে অনেকগুলি শহরকে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ থেকে বাদ দিয়েছে, বলা হয় সেকথাও। রূপায়ণকারী সংস্থাগুলির বরাদ্দ অর্থ ছাড়ার ব্যাপারে রাজ্যের ঢিলেমিই NSDP-এর কাজে বাধা সৃষ্টি করছে, নজরে আসে তাও। দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষদের বসবাসের উপযোগী বাড়ি তৈরির জন্য বাল্মীকি-আম্বেদকার আবাস যোজনার (Valmiki-Ambedkar Awas Yojana, VAMBAY) মতো কর্মসূচি নেওয়া হয় ২০০১-২০২ সালে। ২০,০০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা অবধি ছাড়ের ব্যবস্থা রাখা হয় শহর অনুযায়ী। উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মতো আধা-রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি শহরের স্থানীয় সংস্থাগুলি (Urban Local Bodies, ULB) কাজে হস্তক্ষেপ না করে শুধু সহায়তাটুকু করলেই ভালো হয়, এমন পরামর্শও থাকে। প্রয়োজনে এই দুইয়ের অংশীদারিত্বের সম্ভাবনার কথাও ভাবা হয়। এক কথায়, দশম পরিকল্পনাকালে পরিষ্কার হয়ে যায় যে গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং ইউএলবি-র প্রাতিষ্ঠানিক নির্মাণ শক্তপোক্ত না করলে নগরোন্নয়নের লক্ষ্যটি অধরাই থেকে যাবে। (http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/10th/volume2/v2_ch6_1.pdf)

একাদশতম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নগরোন্নয়ন প্রকল্পে ও কর্মসূচিতে বেশ কিছু নতুনত্ব চোখে পড়ার মতো :

(১) উন্নততর আর্থিক পরিচালনা এবং ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে নগরভিত্তিক স্থানীয় সংস্থাগুলিকে জোরদার করে তোলা।

(২) শহরের জমির উন্নয়ন করে ও জমির উপর নিয়ন্ত্রণ কিছুটা আলগা করে শহরগুলোর কার্যকারিতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো।

(৩) নগর পরিকাঠামোর আষ্টেপৃষ্ঠে আধা সরকারি সংস্থার একচেটিয়া অধিকারের শিকল ভেঙে শহরের পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য বেসরকারি লগ্নি আকর্ষণের পক্ষে সুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।

(৪) আধা সরকারি ও বেসরকারি কার্যপদ্ধতির ওপর নজরদারির জন্য এক স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গঠন করা।

(৫) দারিদ্র হ্রাস করা।

(৬) বড় আকারে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ব্যবহার ও প্রয়োগ।

নগরোন্নয়নের পন্থাগুলিতে নতুন করে প্রাণসঞ্চার করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার খুব বড় এক উদ্যোগ নেয়। ২০০৫-এ শুরু হয় জওহরলাল নেহরু নগর পুনর্নবীকরণ অভিযান (JNNURM)। নগর পরিকাঠামো ও পরিষেবার সুসংহত উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় এই অভিযানে। প্রথম দফায় বাছা হয় ৬৩টি শহর। শহরের দরিদ্র মানুষদের জন্য আবাসন, জল সরবরাহ, অনাময় ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, নগর পরিবহণ এবং নগরের ভিতরের বা পুরোনো এলাকাগুলির উন্নয়নের মতো প্রাথমিক কিছু পরিষেবার উপর জোর দেওয়া হয়। মেগাসিটি, IDSMT, NSDP এবং VAMBAY-এর মতো অতীতের কর্মসূচিগুলি জুড়ে দেওয়া হয় JNNURM-এর সঙ্গে।

JNNURM কর্মসূচি প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত, (১) নগর পরিকাঠামো এবং শাসনব্যবস্থার জন্য একটি উপ-অভিযান (Sub-Mission on Urban Infrastructure and Governance, UIG) এবং (২) নগরের দরিদ্রদের প্রাথমিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আরও একটি উপ-অভিযান (Sub-Mission on Basic Services to the Urban Poor, BSUP)। এই অভিযানের আওতার বাইরে যে শহরগুলি সেগুলির জন্য রাখা হয় ছোট ও মাঝারি শহরের নগর পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UIDSSMT) এবং সুসংহত আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প (IHSDP)। আবাসন ও শহরের দারিদ্র দূরীকরণ মন্ত্রক BSUP এবং IHSDP-কে সংযুক্ত করে। নগরে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষ ও প্রধানত বস্তিবাসীদের আবাসন ও অন্যান্য প্রাথমিক পরিষেবা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘন আবর্জনার নিষ্পত্তির মতো বিশেষ ব্যবস্থা করাও এই প্রকল্পের অন্তর্গত। JNNURM-এর অন্তর্গত UIG এবং UIDSSMT-এর মতো প্রকল্পগুলির দায়িত্বে আবার আছে নগরোন্নয়ন মন্ত্রক।

জওহরলাল নেহরু নগর পুনর্নবীকরণ অভিযান-এর অন্তর্গত যেকোনও শহরের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা এবং উন্নয়নের পথ নির্ণয়ের মাধ্যমে নগরোন্নয়ন নকশা তৈরি করার ভার বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট শহরটির ওপরই বর্তায়। এছাড়াও, জমির ঊর্ধ্বসীমা পুনর্নির্ণয়, স্থানীয় নগর সংস্থাগুলির হাতে ক্ষমতা প্রদান, ক্ষমতা গঠন এবং

পৌরসভাগুলির জমাখরচের হিসাব রাখার ব্যবস্থার উন্নতির মতো নানা সংস্কার আনা হয়। আধা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কোনও বেসরকারি সংস্থা কীভাবে আর্থিক বা অন্যান্য সাহায্য এগিয়ে দিতে পারে সেদিকেও লক্ষ রাখা হয়। একাদশতম পরিকল্পনায় SJSRY-এর অন্তর্গত দারিদ্র দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান কর্মসূচিগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী, দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বরোজগার ব্যবস্থার মতো কর্মসূচিগুলিতে। কেরালার 'কদম্বশ্রী' এবং দেশের অন্যান্য স্থানে এই ধরনের যে সাধু উদ্যোগগুলি রয়েছে সেগুলিকে SJSRY-এর আওতায় এনে প্রয়োজন মাফিক কাজে লাগানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয় (যোজনা কমিশন, ২০০৮)।

একাদশতম পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে JNNURM-এর অন্তর্গত নগরোন্নয়ন এবং নগর পুনরুজ্জীবন কর্মসূচিগুলির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। JNNURM-এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ ৩-৪ লক্ষ কোটি টাকা। সেখানে ২০০৫-২০১২, এই সাত বছরে, বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬৬,০০০ কোটি টাকা (http://planningcommission.nic.in/plans/mta/11th_mta/chapterwise/chap18_urban.pdf)।

দ্বাদশ পরিকল্পনায় (২০১২-২০১৭) আরও মজবুত JNNURM-প্রকল্পের ব্যাপকতর প্রয়োগে নগর সংস্কার করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। নবরূপে JNNURM-এর বিভিন্ন দিকগুলি হল :

(১) নগর পরিকাঠামো এবং প্রশাসন

(২) রাজীব আবাস যোজনা (Rajiv Awas Yojana, RAY)

(৩) RAY বহির্ভূত শহরগুলিতে বস্তি পুনর্বাসন

(৪) ক্ষমতা গঠন বা ক্যামাসিটি বিল্ডিং তৈরি অথবা বৃদ্ধি।

কর্মসূচিটির সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য নগরায়ণ পরিকল্পনাকে মূলধারায় আনার প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা, সংস্কার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া এবং রূপায়ণের ধীর গতির মতো বাধা অতিক্রম করার দরকার। এই ধীর গতির কারণ মূলত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সম্মতি পেতে এবং প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করতে, দেরি হওয়া। আশ্চর্যজনকভাবে, এখনও এমন অনেক শহর আছে যেখানে এই নগরোন্নয়ন কর্মসূচি শুরুই হয়নি। আবার এমন অনেক শহরও আছে যেখানে হয় কর্মসূচিটি অংশগ্রহণমূলক হওয়া দরকার নয়তো দরকার এটিকে জোরদার করার। সবচেয়ে বড় খামতি হল, পরিকল্পনাগুলির এমনই সংকীর্ণ প্রয়োগধারা যে প্রতি ক্ষেত্রেই মূল শহরের বাইরের আধা-শহর এলাকাগুলি নগরোন্নয়নের ছোঁয়াটুকুও পেয়ে ওঠে না।

রাজীব আবাস যোজনা শুরু হয় ২০১১ সালের ২ জুন। ভারতবর্ষ বস্তিমুক্ত করার লক্ষ্যে দুই বছরের একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প ছিল এটি। শেষমেশ ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পকে ২০১৩-২০২২ সময়কালের জন্য অনুমোদন দেয়। আবাসিকদের, বস্তির চিরাচরিত বাসস্থানের থেকে উন্নত বাসভূমির অধিকার দানে রাজ্য ও শহরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তা করা এবং ভবিষ্যতে নগরায়ণের ফলে শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য পুনরায় নতুন বস্তি গজিয়ে উঠতে যাতে না পারে সেদিকে নজর দেওয়াও ছিল প্রকল্পটির অন্যতম লক্ষণীয় বিষয়। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের অথবা এই দুইয়ের অধীন কোনও প্রতিষ্ঠানের, সংসদে পাশ হওয়া আইনভিত্তিক কোনও স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের, ULB-এর এবং কোনও আধা-সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার জমিতে বর্তমান এমন অথবা অন্য কোনও শহর এলাকার যেকোনও বস্তির জন্যই এই প্রকল্পটি প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, নগরের পরিকল্পনা আছে এমন এলাকার ভিতরে প্রায় নগরায়িত কোনও গ্রামের বাসিন্দা অথবা গৃহহীন শহরবাসী বা ফুটপাথবাসী সকলেই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

দ্বাদশ পরিকল্পনার সময়কালে জাতীয় নগর জীবিকা অভিযান (National Urban Livlihood Mission, NULM)-এর জন্য SJSRY-এর অন্তর্গত নগরের দারিদ্র হ্রাস করার এবং কর্মসংস্থানের মতো কর্মসূচিগুলির পালে নতুন হাওয়া লাগে। অভিযানটির মূল লক্ষ্য, সম্ভাবনাময় সব জীবিকার জন্য শহরের দরিদ্র মানুষদের দক্ষ করে তোলা। বিশেষজ্ঞরা খেয়াল করেন যে সংবিধানের ৭৪তম সংশোধন এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কারণ খুঁজতে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে প্রথমত ULB-গুলিকে সংবিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ ক্ষমতাদানে রাজ্য সরকার এখনও ব্যর্থ। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় স্তরে যাবতীয় কর্মসূচিগুলিকে একজোট করা এবং নগর এলাকাগুলিকে অনন্য নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা এখনও সফল না হওয়া (HPEC 2011 : 23)।

নগর শাসনব্যবস্থা এবং পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ রাস্তা

সাধারণত দেখা যায় যে, ভারতের সব পরিকল্পনাই প্রায় কেন্দ্রনির্ভর, ক্ষেত্রভিত্তিক এবং উপর থেকে নীচের স্তরে গতিশীল। নগরোন্নয়ন কর্মসূচিটিও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও নগরোন্নয়নের দায়িত্ব রাজ্যের ওপরেও সমানভাবেই বর্তায় তবুও দেখা যায় যে রাজ্যগুলি নিজে থেকে কোনও সুসংহত নগরোন্নয়ন পরিকল্পনা বা পন্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টা না করে সম্পূর্ণভাবে ভারতের যোজনা কমিশনের মুখাপেক্ষী হয়েই রয়েছে। অন্যদিকে নগরোন্নয়ন মানেই কিছু প্রয়োজনীয় অথচ বিশেষ পরিষেবা, যেমন, বিদ্যুৎ, পরিস্রুত পানীয় জল, অনাময় ব্যবস্থা, রান্নার গ্যাস ইত্যাদির বিরাট চাহিদা। যেকোনও শহরে নির্বিঘ্নে যান চলাচল, বায়ু ও জলদূষণ, আবর্জনা এবং আইনশৃঙ্খলার মতো বিষয়গুলির দায়িত্ব নিতে পারে একমাত্র সেই শহরের স্থানীয় প্রশাসন। তাই নগর পরিকল্পনা এবং নগরোন্নয়ন দায়িত্ব পৌরনিগম, পৌরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় সংস্থার হাতেই ন্যস্ত থাকা উচিত। সমর্থনে থাকবে রাজ্য সরকার। দায়িত্ব, কর্মসম্পাদন, আর্থিক সম্পদ ও স্বশাসনের মতো বিষয়গুলিতে আঞ্চলিক প্রশাসনকে যথোপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া দরকার। বাড়াতে হবে ULB-এর প্রশাসনিক, পরিচালন এবং প্রায়োগিক ক্ষমতাও। বেশ কয়েকটি পৌরসভাকে জড়িয়ে গড়ে ওঠা বিরাট বিরাট নগরপুঞ্জ

(যার মাঝে ছড়ানো-ছেটানো আছে একাধিক গ্রাম)-এর দায়িত্বে থাকবে মহানগর পরিকল্পনা সমিতি বা Metropolitan Planning Committee। এই ধরনের কমিটি গড়ে তোলার বিধান সংবিধানের ৭৪তম সংশোধনেই দেওয়া আছে। একদিকে যেমন ভারতের বেশিরভাগ শহরগুলির ক্ষেত্রে কার্যকরী নগর পরিকল্পনার অভাব তেমনই অন্যদিকে এরকম বড় শহরও অনেক যেগুলির জন্য বহু বছর আগে করা পরিকল্পনা থাকলেও, বর্তমানে তা অচল। তাছাড়া এই পুরোনো পরিকল্পনাগুলি শহরবাসী বা বিশেষভাবে দরিদ্র মানুষ—কারওরই চাহিদা পূরণ করে না। যেসব ক্ষেত্রে পরিকল্পনাগুলি সময়ের সঙ্গে বদলানো হয়েছে অথবা নতুন যেসব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার বেশিরভাগই তৈরি করেছেন কেবল বিশেষ পরামর্শদাতা বা প্রায়োগিক বিশেষজ্ঞরা। আসলে কার্যকরী এবং চাহিদামাফিক পরিকল্পনার জন্য অবশ্য প্রয়োজন শহরবাসীদের সরাসরি অংশগ্রহণ। এককথায়, উপযুক্ত পরিকল্পনা কেবলমাত্র বিকেন্দ্রীকরণ এবং যোগদানমূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব। তার সঙ্গে দরকার সংশ্লিষ্ট ULB-দের ৭৪তম সংশোধন অনুযায়ী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন এবং তারপর ক্ষমতাদান। নির্বাচিত নগরপালকেই নিতে হবে ক্ষমতা ও কর্মসম্পাদনের দায়। পৃথিবীর বহু বড় বড় শহরের দায়িত্বে আছে নির্বাচিত স্থানীয় শাসকদল যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন নগরপাল স্বয়ং। লন্ডন ও নিউ ইয়র্কের মতো শহরের নগরপালেরা যেমন সরাসরিভাবে নিজ নিজ শহরের শাসনব্যবস্থার দায়িত্বে রয়েছেন তেমনি তাদের হাতেও রয়েছে পর্যাপ্ত সম্পদ, ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা। যেহেতু নগর প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে উপযুক্ত সম্পদ এবং ক্ষমতার অভাব তাই পরোক্ষভাবে শহরগুলির দায়িত্ব চলে যাচ্ছে নগরোন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মতো আধা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির হাতে, প্রাধান্য পাচ্ছে শুধু ভূসম্পত্তি এবং পরিকাঠামোগত পরিষেবা। স্বভাবতই মার খাচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলি। নগরোন্নয়ন রাজ্য সরকারেরই অধীন, তাই নগর সংস্কার প্রথম পদক্ষেপটি নিতে হবে রাজ্য সরকারকেই। শাসন এবং আর্থিক ক্ষমতা দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে। আসলে, নগর মাত্রেই গুটিকয়েক মানুষের হাতে ক্রমাগত পুঁজি বৃদ্ধির উপায় নয়, আসলে নগর হল নিরবচ্ছিন্নভাবে মানবোন্নয়নের কাজ সম্পাদনের এক যন্ত্রবিশেষ।❑

[লেখক আর বি ভগত মুম্বইয়ের ইন্টারন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেসের অভিবাসন ও নগর সংক্রান্ত পঠন-পাঠন বিভাগের প্রধান]

পাঠ্যসূচি :

Bose, Ashish (1980) *India's Urbanization 1901-2001,* Second Revised Edition, Tata McGraw Hill Publishing Company Limited, New Delhi.

Bhagat, R.B. and Mohanty, S. (2009) Emerging Pattern of Urbanization and the Contribution of Migration in Urban Growth in India, *Asian Population Studies,* Vol. 5, No. 1, 2009, pp. 5-20.

Planning Commission, Govt. of India (2008) *Eleventh Five Year Plan (2007-2012), Vol. III : Agriculture, Rural Development, Industry, Services and Physical Infrastructure,* Oxford University Press, New Delhi : 394-422.

Planning Commission, Govt. of India (2013) *Twelfth Five Year Plan (2012-2017), Vol. II : Economic Sectors,* Sage Publication India Pvt. Ltd., New Delhi : 318-361.

Planning Commission, Govt. of India (2010) Reference Material 2010, Notes on the Functioning of Various Divisions, Planning Commission, Govt. of India, New Delhi.

HPEC (High Powered Expert Committee) (2011) *Report on Indian Urban Infrastructure and Services,* Ministry of Urban Development, Government of India.

Ramachandran, R. (1989) *Urbanisation and Urban Systems in India,* Oxford University Press, Delhi.

Shaw, Annapurna (1996) "Urban Policy in Post-Independent India : An Appraisal", *Economic and Political Weekly,* January 27, pp. 224-28.

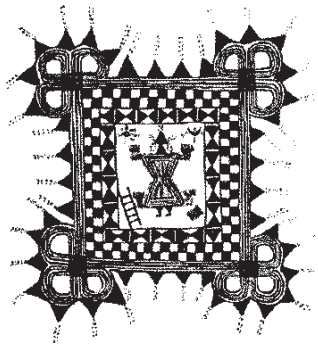

শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার কৃষি

শহর ছড়াচ্ছে। গ্রামের মানুষও শহরেই গিয়ে উঠছে। ফলে 'দাদুর দস্তানা'র গল্পের মতো শহর ফুলে ফেঁপে যেন ফেটে যাওয়ার উপক্রম। তার থেকে বড় এক সমস্যা হল ছড়াতে ছড়াতে শহরায়ণ প্রক্রিয়া এবার আশপাশের সবুজ ও কৃষি জমিকেও গ্রাস করছে। এই সমস্যা হয়তো ভবিষ্যতে গুরুতর হয়ে দেখা দেবে। আজ এবং কালের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কংক্রিট ও সবুজের সহাবস্থান কীভাবে ঘটানো যেতে পারে তা নিয়ে লিখছেন **সগর মৈত্র।**

বিগত শতকের শেষার্ধ থেকে নগরায়ণের বিস্তার ঘটতে শুরু করেছে এবং তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। ঘন সবুজ গাছপালা বা নির্মল প্রকৃতি—এসব নিছকই আভিধানিক শব্দে পরিণত হয়েছে, কল্পনা বা অতীতের গ্রাম্য পরিবেশের স্মরণে এগুলো ভিড় করে মস্তিষ্কে। শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় বাস্তবে আমাদের দৃশ্যপটে ঠাঁই করে নেয় কংক্রিটের রূঢ় জঙ্গল ও নাগরিক বিষণ্ণতা। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। খুব কম সংখ্যক মানুষেরই স্মরণে আছে যে, ২০০৮ সালটি হল সেই বছর, যখন সারা বিশ্বের মোট জনসমষ্টির অর্ধেকেরও বেশি মানুষ (সংখ্যাটা তিন বিলিয়নেরও বেশি) নগরবাসী হয়েছেন।

এবারে আমাদের দেশের দিকে তাকানো যাক। ১৯০১ সালের জনগণনায় দেখা যায়, সেইসময় শহরবাসী মানুষ ছিলেন মাত্র ১১.৪ শতাংশ। ২০০১ সালে ২৮.৫৫ শতাংশ মানুষ শহুরে হয়েছেন, আর ২০১১ সালে তা পৌঁছয় ৩১.১৬ শতাংশে। ২০০৭ সালের রাষ্ট্রসংঘের জনসংখ্যা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ২০৩০ সাল নাগাদ ভারতের ৪০.৭৬ শতাংশ মানুষ শহরবাসী হবে। এশিয়ায় এখন দ্রুত নগরায়ণ ঘটে চলেছে। এই মহাদেশের ৪২.২ শতাংশ মানুষ নগরবাসী। বিশ্বের ২০টি সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ ও জনবহুল শহরের মধ্যে ১৩টি-ই এশিয়ায়। অন্যদিকে রাষ্ট্রসংঘের অধীনস্থ খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের (FAO) অনুমান হল, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৯.৩ বিলিয়নে পৌঁছে যাবে এবং ৭০ শতাংশ মানুষ হয়ে উঠবেন শহরবাসী। সেইসময় খাদ্যের চাহিদা এখনকার তুলনায় ৭০ শতাংশ বেড়ে যাবে। তখন ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ (২০৫০ সালে আমাদের দেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১.৭ বিলিয়ন), পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ মানুষের বাসভূমি হয়ে উঠবে আমাদের এই দেশ। অথচ তখন পৃথিবীর মোট ব্যবহারযোগ্য স্বাদু জলের ৪ শতাংশ থাকবে আমাদের দখলে, আর পড়ে থাকবে মাত্র ২ শতাংশ কৃষিজমি। তখন ভারতের ১০০ কোটি মানুষ হয়ে উঠবেন নগরবাসী (মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি)।

তখন আমাদের দেশের এই বিশাল জনসমষ্টির ক্ষুন্নিবৃত্তি কীভাবে হবে? এখনকার জনসংখ্যাকেই লালন করতে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। খাদ্যশস্য উৎপাদনে এখন আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু গণবণ্টন ব্যবস্থার পরিসংখ্যান যা-ই হোক না কেন, কঠোর সত্য হল যে, বর্তমানে চার বছরের কম বয়সি শিশুদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যকই অপুষ্টির শিকার, ৩০ শতাংশ সদ্যোজাত শিশু কম ওজনের, ৬০ শতাংশই মহিলাই রক্তাল্পতার শিকার। বর্তমানের এই ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা যদি সামনের দিকে তাকাই, তাহলে আগামী দিনে পেট-ভরা খাবারের জোগান দেওয়াই আমাদের কাছে যেখানে একটা বড় চ্যালেঞ্জ, সেখানে পুষ্টির গ্যারান্টি করা তো 'বোঝার ওপরে শাকের আঁটি' হয়ে দাঁড়াবে। সেইসঙ্গে বিশ্বায়নের লহরীতে তাল মিলিয়ে শহরবাসীর একটা অংশের খাদ্য পছন্দ ও চাহিদার যে পরিবর্তন হয়ে চলেছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চলা সত্যিই দুরূহ হয়ে উঠবে। ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকা কৃষিজমির ওপরে চাপ বাড়বে। কিন্তু তাতেও কি আমাদের দেশের এই বিশাল জনসমষ্টির উদরপূর্তি সম্ভব? অবশ্যই দ্বারস্থ হতে হবে বিকল্প ব্যবস্থার। সেই বিকল্প ব্যবস্থার একটি হল 'শহরের কৃষি' (urban agriculture)। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের কৃষি কমিটির পঞ্চদশ আলোচনা সভায় এবং আরও পরে ২০০২ সালে বিশ্ব খাদ্য শিখর সম্মেলনে শহরের কৃষি মান্যতা পায়।

খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (FAO)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'শহরের কৃষি' হল এমন এক শিল্প (বা উৎপাদন ব্যবস্থা), যার দ্বারা শহরবাসীর প্রাত্যহিক চাহিদা মেটাতে শহর ও সংলগ্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদ ও জৈববর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করে প্রাণীপালন, মাছচাষ, জ্বালানি ও খাদ্য (এবং ফুল) উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় শহরের কৃষিকে যথেষ্ট বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়। বর্তমান সময়ে এর পরিসীমা বিস্তার লাভ করেছে। কেবলমাত্র শহর নয়, শহর সংলগ্ন এলাকার চাষবাসে এবং ফসল নির্বাচনে পরিবর্তন এসেছে, তৈরি হয়েছে নতুন শব্দবন্ধ 'শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার কৃষি' (urban and peri-urban agriculture, যা সংক্ষেপে UPA নামেই বেশি পরিচিত)। এই নিবন্ধে

শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার কৃষি সম্ভাবনা, প্রকৃতি, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতার দিকে আলোকপাত করা হল।

শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার কৃষির সুবিধা

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোয় শহরবাসী গ্রামীণ এলাকায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য ভোগ করে থাকেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনও লক্ষ করা যাচ্ছে। কিচেন গার্ডেন, ছাদে বা ব্যালকনিতে বাগান, হাইড্রোপনিক প্রভৃতির প্রসার ঘটছে শহর ও শহরতলিতে। এর সবটা যে বাণিজ্যিক গুরুত্বের কথা চিন্তা করে তা নয়। বিনোদন, দৃশ্যপট সৃজন, নিত্যপূজার ফুল প্রাপ্তি, মানসিক প্রশান্তি লাভ—এইসব বিষয়ও এক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, আখেরে এসবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভজনক। এবারে শহর ও সংলগ্ন এলাকার কৃষিকর্মের সুবিধাগুলোর দিকে তাকানো যাক।

● শহুরে মানুষেরা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত তাজা কৃষিপণ্য হাতের নাগালে পেয়ে থাকেন। যদি তা স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে উৎপাদিত হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

● বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না নিলেও কোনও গৃহস্থ যদি নিজের চাহিদামতো বাড়ির ছাদে বা ব্যালকনিতে, উঠোনে বা কিচেন গার্ডেনে শাকসবজি, ফুল ইত্যাদি উৎপাদন করেন, তাহলে এই খাতে তাঁর নিত্যদিনের ব্যয় কমে, আর্থিক সাশ্রয় হয়। নিম্ন আয়ের শহরবাসীদের মধ্যে অনেকেরই রোজ বাজার করার সামর্থ্য থাকে না, তাঁরা শপিং মলে থরে থরে সাজানো টাটকা শাকসবজি কিনতে পারেন না। সেক্ষেত্রে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে অধরাই রয়ে যায়। পরিবারের পুষ্টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ বেশ কার্যকরী। তাছাড়া উদ্বৃত্ত উৎপাদন বেচে দু-পয়সা আয়ের সুযোগ রয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা উৎপাদক যদি বিষাক্ত কৃষিবিষ ব্যবহার না করেন এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি মেনে চাষ করেন, তাহলে সেই পণ্য স্বাস্থ্যের পক্ষেও হিতকর হয়ে ওঠে। তাছাড়া ঘরোয়া বাগানে উৎপাদিত ফসল শহুরে ও অবাণিজ্যিক উৎপাদককে এক সৃষ্টির আনন্দ দেয়। এই বাগানের জন্য তিনি যে কায়িম শ্রম দিয়ে থাকেন, তা ব্যায়ামের শামিল, শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

● প্রয়োজনীয় জলের জোগান দিতে যদি বৃষ্টির জল চয়ন বা water harvesting করা হয় (হতে পারে তা গামলায় বা চৌবাচ্চার ছোট পরিসরে), তার মূল্যও অনেক। তাছাড়া শহরের বর্জ্য জল পুনর্ব্যবহারের সুযোগও রয়েছে।

● শহরের জৈব বর্জ্যকে কাজে লাগিয়ে জৈবসার তৈরি করার সুযোগ রয়েছে এবং সেইসব জৈবসার কৃষিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। মূল্যবান রাসায়নিক সারের পরিবর্তে এগুলি ব্যবহার করলে চাষের খরচ কমে। বলা বাহুল্য, জৈব কৃষি উপাদান প্রয়োগে উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎকৃষ্ট গুণমানের হয়ে থাকে।

● শহর ও শহরতলিতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে উপভোক্তার কাছে পৌঁছয়। মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপট এখনে প্রায় থাকে না বললেই চলে। তার ফলে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেতে পারে না।

● চিরকালই গ্রামে উৎপাদিত কৃষিপণ্য শহরে আসে। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত পাঠানোর এই প্রক্রিয়ায় ফসল তোলার পরে সঠিক পদ্ধতি মেনে সংরক্ষণ (কোনও কোনও পণ্যের ক্ষেত্রে শীতলীকরণ) ও পরিবহণ করতে হয়। এর জন্য সময় লাগে, জ্বালানি খরচ হয়। এখন আকালের এই সময়ে যদি কিছুটা কৃষিপণ্য শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকাতেই উৎপাদন করে নেওয়া যায় তো মন্দ কী!

● শহরে যেসব পতিত জমি ও অব্যবহৃত স্থান ফাঁকা পড়ে থাকে, তা যদি কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তা আখেরে লাভজনক হয়।

● শহর ও শহরতলির কৃষির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অন্যতম আলোচিত বিষয়। সাধারণভাবে কৃষির উপযোগী প্রাকৃতিক সম্পদের (জমি, জল ইত্যাদি) ভাঁড়ার যদি ছোট হয়, তাহলে পরিবারের প্রধান শ্রম দানকারী পুরুষ সদস্যেরা ভিন্ন কাজে যুক্ত থাকেন। সেক্ষেত্রে মহিলারাই শহর ও শহরতলির কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার চালিকাশক্তি হয়ে ওঠেন।

● নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক জীবনে পারস্পরিক আলাপচারিতা ও মতবিনিময়ের সুযোগ বড়ই কম। কিন্তু কৃষি পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শামিল হওয়ার সুবাদে ক্রেতা ও বিক্রেতা আলাপচারিতার সুযোগ পান। তৈরি হয় সুসম্পর্ক, বাড়ে আত্মীয়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা।

● নগরজীবনে বেড়ে ওঠা শিশু বা নতুন প্রজন্মের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকে না এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে শহর ও শহরতলির কৃষি তার নিজস্ব অবয়ব নিতে পেরেছে, সেখানে এই প্রজন্ম সহজেই কৃষিকে চাক্ষুষ করতে পারে, নিতে পারে কৃষি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা।

● খরা, অতিবর্ষণ, বন্যা, ঝড়ঝঞ্ঝা বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ বা অন্য কোনও রাজনৈতিক সংকটের সময় পরিবহণ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কিংবা পরিবারের প্রধান সদস্য রোগভোগের কারণে সাময়িক অক্ষম হলে বা চলাফেরা করতে না পারলে সংসারে নিত্যদিনের টাকটা শাকসবজির জোগান অব্যাহত থাকে।

কৃষকের শ্রেণিবিভাগ

জীবিকার সন্ধানে রাজ্যের, দেশের, এমনকী ভিনদেশের মানুষও শহরে বসতি স্থাপন করেন। স্থায়ী বাসিন্দারা তো রয়েছেনই। ফলে নানা ধর্ম-সংস্কৃতি-বিত্ত-মানসিকতার সন্নিবেশ হয় শহরে এবং শহর সংলগ্ন এলাকায়। ভাড়াটে বা গৃহস্বামী, যে-ই হোন না কেন, শহর ও সংলগ্ন এলাকার কৃষিতে তাঁদের নিজস্বতার ছাপ রয়ে যায়। মোটামুটিভাবে ভারত তথা আমাদের রাজ্যের শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার কৃষিতে যেসব কৃষকের যোগদান লক্ষ করা যায়, তাঁদের বিত্ত ও সামাজিক পরিচয়ের নিরিখে একটা শ্রেণিবিভাগের চেষ্টা করা হল।

● **কম আয়ের কৃষক :** সংখ্যার বিচারে দেখা যায়, শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার

কৃষিতে কম আয়ের কৃষকের যোগদানই সবচেয়ে বেশি। এঁরা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে কম আয়ের কোনও পেশায় যোগ দেন। গ্রাম বা কৃষির টান, সহজাত ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ এঁদের কৃষিতে টেনে আনে। আংশিক সময়ের জন্য বা অতিরিক্ত/পরিপূরক আয়ের উৎস হিসাবে এঁরা কৃষিকে গ্রহণ করেন। যেহেতু এঁদের পুঁজি কম, সেকারণে ছোটখাট উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এঁদের প্রয়াস। উদ্যানপালন, চৌবাচ্চায় বা ডোবায় মাছ চাষ, দু-একটা গোরু পোষা—এই হল এঁদের কৃষিকর্ম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব কৃষক ও পরিবারের প্রধান পুরুষ সদস্যেরা আংশিক সময়ের জন্য নিজেদের কৃষিতে নিয়োজিত করেন এবং বাকি সময় শহরে অন্য কোনও বৃত্তিতে যুক্ত থাকেন। পরিবারের মহিলারা এইসব কৃষিকর্মের দেখভাল করেন।

● **মাঝারি আয়ের কৃষক :** শহর ও সংলগ্ন এলাকার দু-চার বিঘা জমির মালিকেরা এই শ্রেণিতে পড়েন। আবার অনেকসময় দেখা যায় যে, ভূমিহীন কোনও কৃষক লিজ নিয়ে মাঝারি আয়তনের খামার পরিচালনা করে থাকেন। শহরের জনঘনত্ব ক্রমবর্ধনশীল। নিত্যনতুন কৃষিপণ্যের চাহিদা তৈরি হতে থাকে শহরে। সেই চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে এই শ্রেণির কৃষকেরা কৃষিপণ্য উৎপাদন করে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের উদ্যান ফসল চাষ, মাছচাষ, গোপালন প্রভৃতি কৃষিকর্মকে এঁরা যথেষ্টই অর্থবহ করে থাকেন।

● **বেশি আয়ের কৃষক এবং/ উদ্যোগপতি :** উচ্চ বিনিয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে এরকম শহুরে বা গ্রামের মানুষ বা উদ্যোগপতিরাও শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার কৃষি উৎপাদনে নিজেদের শামিল করে থাকেন। রপ্তানিযোগ্য ফুল-ফল-বেশি দামি সবজি, শপিং মল বা অভিজাত বিপণির চাহিদাভিত্তিক পণ্য উৎপাদনে এঁদের অংশগ্রহণ দেখা যায়। এঁদের হাত ধরেই গ্রিনহাউস/পলিহাউসের সুরক্ষিত পরিবেশে উৎপাদিত উৎকৃষ্টমানের কৃষিপণ্যে পুষ্ট হয়ে থাকে শহরের কৃষিসম্ভার। শিক্ষিত যুবকেরাও এখন স্বনিয়োগের লক্ষ্যে হাইটেক কৃষিতে নামছেন, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে এবং ব্যাংক ঋণের আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে তাঁরা কৃষিতে সদর্থক অবদান রাখছেন। এখন আবার কর্পোরেট সংস্থাও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় শামিল হচ্ছেন। কেবলমাত্র উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ থাকছেন না তাঁরা, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনেও অংশ নিচ্ছেন।

● **কৃষি সমবায় সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন :** কৃষকদের সমবায় সমিতিকে একাজে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তেমনি দেখা যায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও শহর ও সংলগ্ন এলাকার কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে অংশ নিতে। শহরে বা শহরতলিতে অব্যবহৃত ও পতিত জমি, পুকুর বা কৃষিকাজে ব্যবহারের উপযোগী সরকারি সম্পত্তি যেগুলো থাকে, তা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কৃষক সমবায় সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এগিয়ে আসার নজির দেখা যায়।

● **স্বনির্ভর গোষ্ঠী :** এখন পুরুষ ও মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে কৃষি ও আনুষঙ্গিক কাজে যুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের রাজ্যের কলকাতা বা অন্যান্য শহর ও সংলগ্ন এলাকায় এইসব গোষ্ঠী সাফল্যের সঙ্গে মাছ চাষ, মাশরুম চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ, রঙিন মাছ চাষ প্রভৃতি কাজ করে চলেছে।

● **ছিন্নমূল মানুষ :** উদ্বাস্তু বা শরণার্থী, যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, আসলে তাঁরা ছিন্নমূল। শিকড় ছিঁড়ে, বাস্তুভিটে ছেড়ে আসার কারণ বিভিন্ন হতে পারে—প্রাকৃতিক কারণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা বা আর্থ-সামাজিক কারণ। যে জায়গায় এঁদের ঠাঁই মেলে, সেই জায়গাটাকেই এঁরা আপন করে নেন, খুঁজতে থাকেন বাঁচার রসদ। শহরে যেহেতু পেশার বৈচিত্র ও সুযোগ রয়েছে এবং উন্নত পরিষেবা পাওয়া যায়, সেকারণে উদ্বাস্তুরা শহর ও সংলগ্ন এলাকায় ঠাঁই করে নেন। বসত এলাকার বাইরে স্বল্প পরিসরে চাষবাসও করেন। দেশের বিভিন্ন শহরে এঁদের উপস্থিতি দেখা যায়।

● **শখের বাগানী :** এক চিলতে ব্যালকনি, ছাদ বা একফালি উঠোন—এইসব জায়গাকে ব্যবহার করে অনেক শহরবাসীই কিচেন গার্ডেন করে থাকেন, নিজের চাহিদামতো ফুল লাগান। এঁরা যে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করেন তা নয়, বরং শখ চরিতার্থ করাই এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই শখের মধ্যেই তাঁরা খুঁজে নেন এক মুঠো প্রকৃতি।

স্থান ও জমি

শহর ও সংলগ্ন এলাকার কৃষিতে স্থান ও জমি নির্বাচনের বিষয়টি যথেষ্ট বৈচিত্রময় ও গুরুত্বপূর্ণ। মোটামুটিভাবে যে জায়গাটা অব্যবহৃত বা খালি বলে মনে হবে, সেখানেই চাষবাস করা যেতে পারে, অবলম্বন করা যেতে পারে কৃষির সহযোগী অন্যান্য কর্ম। তবে কৃষির প্রকৃতি ও ফসল নির্বাচনের বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভর করে কোন ধরনের জমি বা স্থান, কত দিন পাওয়া যাবে, শহরের মধ্যে নাকি সংলগ্ন এলাকায়, জলের লভ্যতা—ইত্যাদি বিষয়ের ওপরে। কৃষকের শ্রেণিবিভাগের প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের স্থান, জমি, কৃষিকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সেগুলোকেই শ্রেণিবিভাগ করে তুলে দেওয়া হল।

● **বসতবাড়িতে এবং চারপাশে :** বাড়ির পিছনের ফাঁকা জমি (backyard), বাড়ির পাশের ফাঁকা জায়গা বা সামনের উঠোনে চাষবাস করা হয়ে থাকে। সামনের দিকে সাধারণভাবে ফুল চাষই করা হয় এবং সবজি বা অন্যান্য ফসল চাষ না করাই ভালো। কারণ বাড়ির সামনের দিকে যদি রাস্তা থাকে, তাহলে সরাসরি গাড়ির ধোঁয়া এসে ফসলে লেগে থাকে, এই ধোঁয়ায় সিসা (lead) থাকে, যা ফসলকে দূষিত করে। ঘন বসতিপূর্ণ শহরে এইসব ফাঁকা জমি থাকে না বললেই চলে। সেক্ষেত্রে ছাদে, ব্যালকনিতে বা ঘরের মধ্যে চাষ করা হয়। বাড়িতে যদি এক চিলতে জমি থাকে সেই জমিতে বা জমি না থাকলে টবে লতানো ফসলের (যেমন লাউ, করলা, কুমড়ো ইত্যাদির) বীজ বুনে গাছটিকে ছাদে লতিয়ে যাওয়ার পথে চালিত করা হয়। ঘরের ভেতরে খাঁচায় পোল্ট্রি বা চৌবাচ্চায় রঙিন মাছ ও অন্যান্য খাওয়ার উপযোগী মাছ চাষ করা হয়। তাছাড়া, খরগোশ পালন, বাহারি পাখি পালন, কোয়েল পালন, মাশরুম চাষ প্রভৃতি করা হয়। এখন হাইড্রোপনিকও করা হচ্ছে। বড় বড় শহরে দেওয়ালকে ব্যবহার করে করা হচ্ছে

ভার্টিক্যাল গার্ডেন। মুম্বইয়ে এখন ভার্টিক্যাল গার্ডেন কর্পোরেট বহুতলের ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে।

● জনসাধারণের জমি : খাস জমি বা স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার (পৌরসভা, পৌরনিগম) হাতে রয়ে যাওয়া জমিগুলোকে কৃষিকর্মে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণভাবে এগুলো ব্যক্তি বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা সংস্থাকে লিজ দেওয়া হয়। এইসব জমির আয়তন অনুযায়ী এবং স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে কৃষি ও তার সহযোগী কর্মগুলোকে এখানে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

● **কলকারখানার ফাঁকা জমি :** কল-কারখানার ঘেরা জায়গার মধ্যে শিল্প উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা বাদেও ফাঁকা জমি রয়ে যায়। সেখানে কৃষিকর্ম করার একটি বড় সুবিধা হল দূষণ রোধ। বড় বড় বাণিজ্যিক সংস্থা এই ফাঁকা স্থানে উদ্যান ফসল লগিয়ে থাকেন। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির জামনগরের কথা, যেখানে উচ্চ ঘনত্বের আমবাগান তৈরি করে উৎকৃষ্ট গুণমানের আম উৎপাদন করা হচ্ছে।

● **রাস্তার ধার :** সামাজিক বনসৃজনে বা শহরের সৌন্দর্যায়নে যেসব গাছ লাগানো হয়, তা থেকে কাঠ বা জ্বালানি পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কাষ্ঠল ফলগাছও লাগানো যেতে পারে, যা থেকে পাওয়া যেতে পারে ফল এবং তা হতে পারে বাড়তি পাওনা।

● **নদীর পাড় :** শহর ও সংলগ্ন এলাকায় সাধারণভাবে একটি নদী থাকে। বিভিন্ন ধরনের বর্ষজীবী ফসল, সবুজ গোখাদ্য, পাড়ের ভাঙনরোধী গাছপালা—এইসব এখানে লাগানো হয়। চর বা দ্বীপভূমিতে লাগানো হয় ফল-ফুল-বাহারি গাছপালা।

● **পুকুর ও জলাজমি :** শহর ও সংলগ্ন এলাকার পুকুর ও জলাজমিতে মাছ, মাখনা, পানিফল, পদ্মফুল প্রভৃতি চাষ করা হয়। এই ধরনের জলাভূমি শহরে খুব একটা বেশি দেখা যায় না। তবে শহরে নয়, শহর সংলগ্ন এলাকায় এগুলো সহজলভ্য।

● **চাষের জমি :** শহরের মধ্যে প্রায় দুর্লভ, তবে শহর সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন আয়তনের কৃষি জোত দেখা যায়। নিকটবর্তী শহরের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী এই সব জমিতে সেই এলাকার কৃষি জলবায়ুর উপযোগী প্রায় সব রকমের ফসলই চাষ করা হয়। এখন পলিহাউস/গ্রিনহাউসের মধ্যে বিভিন্ন উচ্চদামি ফসল চাষ করার রীতি দেখা যায়।

এখানে কৃষিকাজের জন্য যে ধরনের জমি বা স্থানের উল্লেখ করা হল, সেখানে কোন ধরনের ফসল চাষ করা হবে, তা নির্ভর করে কত মেয়াদের জন্য তা পাওয়া যাবে এবং জলের জোগানের ওপরে। সাধারণভাবে কৃষকের নিজস্ব জমি ও পুকুর, (যেগুলোর উপস্থিতি শহর সংলগ্ন এলাকায় বেশি) এবং বাড়িতে ও চারপাশে চাষের ক্ষেত্রে কৃষক তাঁর ইচ্ছামতো মেয়াদকাল ঠিক করেন এবং ফসল নির্বাচন করেন। কলকারখানার ফাঁকা জমিকে কৃষিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা হয়। জনসাধারণের জমি বা রাস্তার ধার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। নদীর পাড়ে কোন ধরনের কৃষিকর্ম অবলম্বন করা হবে, তা নির্ভর করে থাকে কোনও এলাকার বৃষ্টিপাত ও জলবায়ুর ওপরে।

কৃষির বৈচিত্র

শহর ও শহরতলির কৃষি বৈচিত্রময়। শহরের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী এবং চাষের পরিকাঠামো অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা হয় বা কৃষির সহযোগী কাজগুলোকে বেছে নেওয়া হয়। কৃষকের শ্রেণিবিভাগ ও কৃষিজমি বা স্থানের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বিভিন্ন কৃষিকর্মের কথা উঠে এসেছে। নীচের সারণিতে সেগুলোর শ্রেণিবিভাগ করা হল।

সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার কৃষিকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো বিষয় রয়েছে, যা সার্বিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর, এমনকী বিপজ্জনকও বটে। এর সুবিধাগুলোর দিকে তাকালে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এটি লাভজনক, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সঠিক নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে এবং পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণে ত্রুটি থাকার কারণে তৈরি হয় সমস্যা। তখন এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলো বেশি করে চোখে পড়ে।

গ্রামের প্রকৃতি তুলনায় নির্মল। শহরে দূষণের মাত্রা বেশি। শহর ও সংলগ্ন এলাকার কৃষিতেও সেই দূষণের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যেতে পারে। মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষতিকারক জীবাণু উৎপাদিত ফসলের সঙ্গে রয়ে যেতে পারে এবং মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারে। গাড়ির ধোঁয়ায় বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যা শহর ও শহরতলির কৃষিপণ্যকে দূষিত করে। যে জল দিয়ে ফসলে সেচ দেওয়া হয়, তাতে যদি জীবাণুর উপস্থিতি থাকে (সালমোনেল্লা, ই-কোলাই, অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ও প্রোটোজোয়া) তাহলে সেই

সারণি
শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার কৃষি বৈচিত্র

কৃষির প্রকার	ফসল/কর্ম	স্থান/ক্ষেত্র
মাছ ও জলজীবভিত্তিক ব্যবস্থা	মাছ, রঙিন মাছ, চিংড়ি, পদ্ম, কলমি শাক, হেলাঞ্চা শাক, মাখনা, পানিফল	পুকুর, খাল, বিল, ডোবা, জলাভূমি, ভেড়ি, মোহনা, ঘরের ভেতর বা বসতবাড়ির চৌবাচ্চা
উদ্যানপালন	সবজি, ফল, ফুল	বসতবাড়ি ও তার চারপাশ, পার্ক, রাস্তার ধার, চাষের জমি, গ্রিনহাউস, হাইড্রোপোনিক্স
প্রাণীপালন	গো-মহিষ পালন, ছাগল-ভেড়া পালন, খরগোশ, শূকর, পোল্ট্রি, কোয়েল	শহরের বাইরের এলাকা (out skirt)/ সংলগ্ন এলাকা, শহরের ভেতরে খাঁচায় পোল্ট্রি, কোয়েল, খরগোশ
কৃষি ও সামাজিক বন	কাষ্ঠল বৃক্ষ ও ফল, গোখাদ্য, সুবাবুল, ধইঞ্চা	রাস্তার ধার, জলাভূমি, নদীর পাড়, পতিত জমি
অন্যান্য	কেঁচোসার, মাশরুম, কিচেন গার্ডেন, ফুল, ওঠধি, বাহারি গাছ	বসতবাড়ি, ছাদ, শহর সংলগ্ন এলাকার কৃষিজমি

জল দ্বারা সিঞ্চিত টাটকা শাকসবজির মাধ্যমে জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। আর্সেনিক ও অন্যান্য ভারী মৌলের দ্বারা দূষিত জল যদি সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে উৎপাদিত ফসলে এইসব ক্ষতিকারক মৌলের উপস্থিতি বেশিমাত্রায় দেখা যায়। শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন সামগ্রী ব্যবহারের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। খারাপ হয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন সামগ্রী শহরের বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়, যা ই-বর্জ্য (e-waste) নামে পরিচিত। উন্নয়নশীল এবং ভারতের মতো জনবহুল দেশে এ এক বড় সমস্যা। এইসব ই-বর্জ্যে রয়ে যায় বিভিন্ন ক্ষতিকারক মৌল ও রাসায়নিক পদার্থ, যেগুলো মাটি ও জলের মাধ্যমে কৃষি বাস্তুতন্ত্রে মিশে যায়। এই দূষণের পরিণাম কিন্তু ভয়ানক হতে পারে।

এছাড়া সেচের জন্য জলচয়নের যে ছোট ছোট আধার বা চৌবাচ্চা ব্যবহার করা হয়, সেখানে বদ্ধ জলে বাড়তে পারে মশার উৎপাত। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, ফাইলেরিয়া, এনসেফেলাইটিসের মতো মশক-বাহিত রোগ ছড়াতে পারে। এসব রোগ ছাড়াও গৃহপালিত পশু-পাখি বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফিভার, এনসেফেলাইটিস, অ্যানথ্রাক্স প্রভৃতি জুনোটিক রোগ (Zoonotic disease) ছড়ায়। শহরের পরিবেশে গোরুর খাটাল, পোল্ট্রি খামার বা শূকর খামার থাকলে দৃশ্য দূষণ তথা শহরের সৌন্দর্যায়নে ব্যাঘাত ঘটে। ছড়াতে পারে দুর্গন্ধ এবং পরিবেশ দূষণ। এইসব খামারের বর্জ্য পদার্থ ও খামার পরিষ্কার করা জল সাধারণ নির্গমন নালার মুখ বন্ধ করে দিতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশে কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কৃষিবিষের ব্যবহার বেশি এবং অনেকক্ষেত্রে যথেচ্ছ। আমাদের দেশেও তাই। এইসব রাসায়নিক কৃষি উপাদান পরিবেশে ও বাস্তুতন্ত্রে মিশে যায়, ঘটায় দূষণ। প্রাণীপালনে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ফসলের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের মোকাবিলায় ব্যবহার করা হয় অ্যান্টিবায়োটিক। একই উপায়ে এগুলোও পরিবেশে ও মানুষের দৈনিক খাদ্যে মিশে গিয়ে মারাত্মক সমস্যা তৈরি করতে পারে। পানীয় জল বা ব্যবহারযোগ্য পরিশুদ্ধ জলের বড় অভাব। শহরে পৌরসভা, পৌরনিগম বা অন্য কোনও সরকারি সংস্থা সামান্য মূল্যে বা বিনামূল্যে এই জল সরবরাহ করে। এই জলের পরিমিত ব্যয় অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু পর্যাপ্ত পানীয় জলের জোগান যদি কোথাও থাকে এবং তা সেচের কাজে যদি ব্যবহার করা হয়, তা অপচয়ের নামান্তর হয়ে থাকে। বর্জ্য জল সেচের কাজে ব্যবহারের আগে তা শোধন করা না হলে কৃষি ফসল সরাসরি দূষণের কবলে পড়তে পারে। এইরকম নানা সমস্যা উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে শহরের কৃষির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়ে যায়।

সমাধানের উপায়

আগামী দিনে খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে শহর ও সংলগ্ন এলাকার কৃষি উৎপাদনের সম্ভাবনাকে অবহেলা করার কোনও উপায় নেই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় শহর ও সংলগ্ন এলাকার কৃষি একটি নির্দিষ্ট অবয়ব পেয়েছে এবং সদর্থক অবদান রাখতে পেরেছে। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলোর তথা ভারতের বড় বড় শহরকে কেন্দ্র করে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। সঠিক নগর পরিকল্পনা ও কৃষিতে স্থানীয়, রাজ্য এবং জাতীয় প্রশাসনের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকা উচিত। সারা বিশ্ব জুড়ে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থা এর মধ্যেই এগিয়ে এসেছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (FAO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), UN-Water Decade Programme on Capacity Development (UNWDPC), আন্তর্জাতিক জল ব্যবস্থাপনা সংস্থা (IWMI) প্রভৃতি। এইসব সংস্থা বিভিন্ন পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও নির্দেশিকা দিয়ে থাকে। তাছাড়া স্থানীয় কৃষক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সহযোগিতায় গড়ে উঠতে পারে একটি আদর্শ মডেল, যা শহর ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সঠিক দিশা দেখাতে পারে। এইসব বিভিন্ন সংস্থার কাজ হল কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি প্রদান করা। এর মধ্যে থাকতে পারে জৈব কৃষি (Organic Farming), সুসংহত উপায়ে শস্য সুরক্ষা (Integrated Pest Management), সুসংহত উদ্ভিদখাদ্য জোগান (Integrated Nutrient Management), ভালো কৃষি রীতি (Good Agriculture Practice) প্রভৃতি সময় উপযোগী প্রযুক্তিগুলো। ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিলে সেদিকে নজর দেওয়া দরকার এবং নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে। পরিবেশ দূষণ, জলের অপচয় প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা নিবারণের সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে। নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের সঠিক পথে চালিত করতে হবে। এইসব এলাকার জন্য সরকারি প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণ করতে হবে। আমাদের দেশে দিল্লি, হায়দরাবাদ, মুম্বই, কলকাতা প্রভৃতি শহর ও সংলগ্ন এলাকার কৃষির বিকাশে সরকারি প্রকল্পের নজির দেখা যায়। 'ভেজিটেবল ইনিশিয়েটিভ ইন আরবান ক্লাস্টার' প্রকল্পের সুবিধা ও আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে কলকাতা সংলগ্ন ভাঙড় দুই নম্বর ব্লকের কৃষকেরা পলিহাউসে উৎপাদন করে চলেছেন উৎকৃষ্ট গুণমানের ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, টম্যাটো প্রভৃতি সবজি, যা শহরের কৃষিকে সমৃদ্ধ করছে। আগামীর লক্ষ্যে এই ব্যবস্থাকে আরও অর্থবহ করতে হবে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

Anonymous, 2013. Urban & Peri-urban Agriculture. ***National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi, Policy paper : 67 :*** 01-11.

Awasthi, Pranati. 2013. Urban Agriculture in India and its challenges. ***International Journal of Environmental Science : Development and Monitoring. 4(2) :*** 48-51.

Kapoor Rana. 2012. Urban Agriculture for food security. ***The Hindu Businessline.*** September 16.

Mahapatra, S.P. 2012. Promoting Urban agriculture in India. ***Seronica Journal.*** 3(2) : 19-27.

Prem Nath. 2013. Concept and Implementation of Food Security and its relevance to Urban and Peri-urban Agriculture. ***Proceedings of Regional Workshop on strengthening Urban and Peri-urban Agriculture towards Resilient Food systems in Asia.*** pp. 20-25.

Singhal Jyoti. 2013. Vegetable Initiative in urban clusters in India. ***Proceedings of Regional Workshop on strengthening Urban and Peri-urban Agriculture towards Resilient Food systems in Asia.*** pp. 81-87.

WBCS -2015 শুরু হচ্ছে নতুন ব্যাচ

নিজের কেরিয়ার জীবনকে কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে সঁপে দেওয়ার আগে দশবার ভাবতে হবে

মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিক। তারপর গ্র্যাজুয়েশন? কিন্তু তারপর...!! জেনারেল স্ট্রীমে পড়া ছাত্রছাত্রীদের মনে উঁকি দেয় এক গভীর উদ্বেগ। এবার একটা চাকরি দরকার। দুঃখের বিষয়, কলেজের পরীক্ষার সঙ্গে চাকরির পরীক্ষার কোন মিলই নেই। বরং বলা যায়, এ দুটি বিপরীত মেরুর পরীক্ষা। সুতরাং ছাত্রছাত্রীরা চরম উদ্‌ভ্রান্ত, ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। ওদিকে আবার প্রায় প্রতি রোববার পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন। চাকরির appointment letter নিয়ে নাকি বসে আছে প্রতিষ্ঠানগুলি। চড়া কোর্স ফি-এর পরিবর্তে চৈত্র সেলের মতো দেদার বিকোচ্ছে চাকরি। কিন্তু বন্ধু! বাস্তব বড়ই রূঢ়। ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কত জন চাকরি পেয়েছে বলা শক্ত, তবে এটা সত্য যে হাজার হাজার চাকরি প্রার্থীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে এই ধরনের ব্যবসা সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের কৃপায়। তাই সাবধান। নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত। নিজের কেরিয়ার-জীবনকে কারও হাতে সঁপে দেওয়ার আগে দশবার ভাবতে হবে।

ব্যাচেলার বা মাস্টার্স করার পর চাকরি প্রার্থীদের সামনে দুটো পথ খোলা থাকে—শিক্ষক কিংবা প্রশাসকের পেশা। শিক্ষকতা নিঃসন্দেহে মহান পেশা। কিন্তু মর্যাদায়, বৈচিত্র্যে, কৌলীন্যে প্রশাসক তথা ডব্লুবিসিএস চাকরির সমকক্ষ নয় আর কোনো চাকরি। ডব্লুবিসিএস—এ নামটা শুনলেই মিডিওকার ছাত্রছাত্রীদের মনে এক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের উদ্রেক হয়। এটা নাকি ভীষণ কঠিন পরীক্ষা, প্রচুর পড়াশুনা করতে হয়, মেধাবী বা ব্রিলিয়ান্ট হতে হয়— ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ভীতিপ্রদ নয়। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষা একাধারে সহজ, আবার কঠিন। যারা ডব্লুবিসিএসটাকে ভালো করে বোঝে, পিএসসি কি চায় পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে তা জানে—তাদের কাছে ডব্লুবিসিএসটা সত্যিই সহজ। আর যারা ডব্লুবিসিএসকে না জেনে না বুঝে অপরিকল্পিত পন্থায় প্রস্তুতি নেয়—ডব্লুবিসিএস তাদের কাছে ভীষণ কঠিন, দুর্গম গিরির মতো দুর্লঙ্ঘ্য।

ডব্লুবিসিএস-এ সাফল্যের জন্য দরকার সঠিক এবং ফুলপ্রুফ স্ট্র্যাটেজি। তার সাথে দরকার সুপরিকল্পিত উপায়ে স্মার্ট প্রস্তুতি। কিন্তু এজন্য দরকার অন্তত একজন দক্ষ ও ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞ গাইডের—যিনি ব্যবসা বুঝবেন কম আর ডব্লুবিসিএসকে বুঝবেন বেশি।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন হল একমাত্র সংস্থা যারা **শুধুমাত্র ডব্লুবিসিএস**-এর গাইডেন্স দেয়। সেই অর্থে সংস্থাকে ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞও বলা যেতে পারে। ডব্লুবিসিএস-২০১১-এর চূড়ান্ত তালিকায় এই প্রতিষ্ঠানের একটি মাত্র ব্রাঞ্চ থেকে সফল হয়েছে ১৩৫ জন। সাফল্যের শতকরা হারে এটি পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর সংস্থা। সদ্য পাশ করা ডব্লুবিসিএস টপাররা এখানকার পঠনপাঠনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তোমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং এই সব ডব্লুবিসিএস টপারদের দক্ষ ও পারদর্শী গাইডেন্সের যুগলবন্দিতে বন্দিত হবে তোমাদের সাফল্যের জয়গান, করায়ত্ত হবে ডব্লুবিসিএস চাকরির নিয়োগপত্র। তাই বন্ধু! আর কিসের দ্বিধা, কিসের দ্বন্দ্ব—সকল জড়তা, সকল অসারতা দূর করে যোগদান করো আমাদের এই কোর্সে, ঝাঁপিয়ে পড়ো সাফল্যের এই মহৎ কর্মযজ্ঞে।

মেনস-২০১৪ এর মক টেস্ট

মেনসের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ১০৫টিরও বেশি মক টেস্ট নেওয়া হবে। টেস্টগুলি শুরু হচ্ছে ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে। প্রথম ২০ জন প্রার্থী পাবেন কোর্স ফি'র ওপর ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্ট।

'Vission-IV'

মেনসের চতুর্থ পত্রের জন্য শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে সামিম সরকার সম্পাদিত দেবাশীষ ঘোষের 'সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এন্ড এনভায়রণমেন্ট' বইটি।

WBCS MAINS CLUB

যারা একবার মেনস পরীক্ষায় বসেছে তারা মাত্র চারশো টাকার বিনিময়ে এই ক্লাবের সদস্যপদ পেতে পারে। এই ক্লাবের সদস্যরা পাবেন কম্পালসরি পত্রগুলির সাজেশন, কিছু নোটস এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সম্পূর্ণ স্টাডি ম্যাট। তাছাড়া পাওয়া যাবে বিভিন্ন পত্রের মক টেস্টের প্রশ্নপত্র। এবারেই সাফল্য লাভের উদ্দেশে আয়োজিত স্পেশাল ক্লাসে যোগদান করার সুযোগও পাওয়া যাবে।

মেনস-২০১৪

ক্লাশরুম গাইডেন্স ঃ নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ১০০ শতাংশ নির্ভরযোগ্য **'Inclusive Mains Batch'** শুরু হয়েছে সবে। ক্লাশরুম গাইডেন্সের সাথে সাথে পাওয়া যাবে প্রতিটি বিষয়ের ওপর ১০০ শতাংশ কমনযোগ্য ডব্লুবিসিএস অফিসারদের দ্বারা সম্পাদিত ব্রান্ড নিউ স্টাডি ম্যাট। সঙ্গে **থাকছে ১০৫টিরও বেশি মকটেস্ট,** যা আপনার পারফরমেন্সকে আরও শানিত ও ক্ষুরধার এবং নিখুঁত করে তুলবে।

পোস্টাল কোর্সঃ অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন চালু করছে **'Inclusive Postal Course'**। সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট, জি কে সহ সকল বিষয়ের কমপ্যাক্ট নোটসের জন্য দূরবর্তী বা কর্মরত পরীক্ষার্থীরা সত্বর যোগাযোগ করুন।

WBCS-2012 Gr.-C/D INTERVIEW Personality Test

'এ' এবং 'বি' গ্রুপের ইন্টারভিউ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। এবারের ইন্টারভিউগুলি ছিল একটু অন্য রকম। কনসেপ্ট বেসড্ নয় বরং ফ্যাক্ট বেসড্। হবি কিংবা অপশনাল থেকে তেমন প্রশ্ন করা হয়নি, কিন্তু ইংরাজি হোমোনিম, ভয়েস বা ন্যারেশন চেঞ্জ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়েছে। 'সি' বা 'ডি' গ্রুপের ইন্টারভিউ কেমন হবে তার আভাস পেতে সত্বর এখানে যোগাযোগ করুন। বার বার মক ইন্টারভিউ দিয়ে নিজের জড়তা কাটিয়ে ভরপুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে পিএসসি-এর বোর্ডের সামনে হাজির হন।

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6, College Street (College Square), Kolkata-700073

✆ 9830770440
✆ 9674478644

Website: www.academicassociation.in ■ Centre: Uluberia-9051392240 ● Birati-9831283568 ● Darjeeling-9832041123

নগর পরিকল্পনা—বাস্তবায়ন, সমস্যা ও পরিবর্তিত ধরন

ভারতের বিভিন্ন শহরে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ও সেই চাপজনিত নানা সমস্যা এড়ানোর উদ্দেশ্যে তার আশপাশে উপনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বহু অর্থ ব্যয় ও বিরাট উৎসাহ ও স্থপতিদের হিসেবনিকেশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এক একটা শহর। প্রথম দিকে সব ঠিকঠাক চলার পর ক্রমশ সেই শহরগুলিতেও দেখা দিয়েছে সমস্যা। কারণ, এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। অর্থাৎ কিনা পরিকল্পনা যতই ভালো হোক, তা বজায় রাখাটাও অত্যন্ত জরুরি। লিখছেন **মহুয়া বর্ধন।**

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতে প্রায় ৩১.২ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করে যা ২০০১ সালে ছিল ২৭.৮ শতাংশ। এর থেকেই বোঝা যায় ভারতে শহরে জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে আর মহানগরীগুলোর উপর চাপও বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের সমস্যা; যেমন—দূষণের সমস্যা, যানজট, আবাসন সমস্যা, পরিবেশগত সমস্যা ইত্যাদি। এসবের মোকাবিলা করার জন্য স্বাধীনতার পর থেকেই নানা সময়ে নানা স্থানে সুপরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা হয়। যদিও স্বাধীনতার আগেই শিল্পনগরী জামশেদপুর আর রাজস্থানের জয়পুর পরিকল্পিত শহর হিসাবে বেশ নাম করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রশাসনিক-ভাবে শহর গড়ে উঠতে থাকে মহানগরীর চাপ হ্রাসের জন্য। সাধারণত সরকারি উদ্যোগে এ ধরনের শহর গড়ে উঠলেও অতি সম্প্রতি বেসরকারি উদ্যোগেও ছোট ছোট আধুনিক ব্যক্তিগত শহরও গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। চণ্ডীগড়, গান্ধীনগরের মতো বড় বড় পরিকল্পিত শহরের পাশাপাশি সল্টলেক, কল্যাণীর মতো ছোট উপনগরী সবই ভারতের আধুনিক নগর পরিকল্পনার ফসল।

এ প্রসঙ্গে পরিকল্পিত শহরগুলোকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

ক) রাজধানী শহর—চণ্ডীগড়, গান্ধীনগর, ভুবনেশ্বর।

খ) নব্যনগর (New Town)—নভি মুম্বই, রাজারহাট-নিউটাউন।

গ) শিল্পশহর—দুর্গাপুর, হলদিয়া।

ঘ) উপনগরী—নয়ডা, সল্টলেক।

ঙ) বক্তিগত নগর— লাভাসা, অ্যাম্বিভ্যালি।

(ক) এই শহরগুলোর বৈশিষ্ট্য হল পরিকল্পনার আগে একটা নির্দিষ্ট মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয় যাতে ভূমি ব্যবহার, জনসংখ্যা, রাস্তাঘাট, পরিবেশগত বিষয় বিশদে আলোচিত হয়। (খ) সাধারণত গ্রাম্য ভূমি বা জনবসতিহীন ভূমিতেই নতুন করে শহর পত্তন হয়। (গ) প্রশাসনিক প্রয়োজনে এখানে পুরানো শহর থেকে অফিস আদালত ইত্যাদি স্থানান্তরিত হয়, (ঘ) এখানে বসতির সঙ্গে পরিষেবার এমন সাজুয্য থাকে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নগরী রূপে গড়ে ওঠে অর্থাৎ শহরের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ইত্যাদি প্রয়োজন শহরেই মেটানো সম্ভব। (ঙ) যদি মূল শহরের কাছেই এ ধরনের শহর তৈরি হয় তবে ধীরে ধীরে তা মূল শহরের সঙ্গে মিশে যায় (Expanded township)। (চ) কখনও কখনও বিশেষ উদ্দেশ্যে (বসতি, শিল্প, প্রশাসন) এ ধরনের শহর তৈরি হয় যার মূল পরিকল্পনা অক্ষুণ্ণ রেখে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে মহানগরীর সমস্যা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয় আর সর্বোপরি উদ্দেশ্য থাকে বাসিন্দাদের যতটা সম্ভব সুখস্বাছন্দ্য দেওয়ার।

এখানে ভারতের কতকগুলো মূল পরিকল্পিত শহরের উৎপত্তি। পরিকল্পনার ধরন আলোচনা করার পাশাপাশি শহরগুলো কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে তার আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ মূল মেট্রোপলিটন শহরগুলোর মতো অতটা না হলেও পরিকল্পিত শহরেও জমি সংকট পরিবেশ, পরিকাঠামো, আবাসন, বস্তি ইত্যাদি সমস্যা লেগেই থাকে যার থেকে প্রশ্ন ওঠে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের নগরায়ণ কি সঠিক পথে যাচ্ছে?

তালিকা-১
ভারতের প্রধান প্রধান পরিকল্পিত শহর

রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	শহর	আয়তন (বর্গকিমি)	মুখ্য উদ্দেশ্য	গড়ে ওঠার সময় (শুরু)	প্রধান স্থপতি
পশ্চিমবঙ্গ	দুর্গাপুর	১৫৪	শিল্প	১৯৫০	—
	কল্যাণী	২৯	বসতি	১৯৫৫	জেএন দাশগুপ্ত
	সল্টলেক	১২.৫	বসতি	১৯৬২	টস্কোভিক
	রাজারহাট-নিউটাউন	২৮	বসতি ও তথ্যপ্রযুক্ত	১৯৯৯	—
পঞ্জাব ও হরিয়ানা	চণ্ডীগড়	১১৪	প্রশাসনিক ও রাজধানী	১৯৬৬	লি করবুসিয়ের
ওড়িশা	ভুবনেশ্বর	১০৩৫	রাজধানী ও প্রশাসনিক	১৯৪৬	অটো-কোনিগস্‌বার্গার
গুজরাত	গান্ধীনগর	১৭৭	রাজধানী ও প্রশাসনিক	১৯৬৫-৭০	এইচ কে মেহওদা ও প্রকাশ আপ্টে
দিল্লি	নয়ডা	২০৩	শিল্প	১৯৭৬	—
মহারাষ্ট্র	নভি মুম্বই	১৬৩	বসতি	১৯৭২	চার্লস কোরিয়া
ছত্তিশগড়	নয়া রায়পুর	৮০.৪	বসতি ও প্রশাসনিক	সম্প্রতি	—

প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার পর ভারতে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়ার সমস্যা। তাছাড়া রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বেশ কিছু নতুন রাজ্যও তৈরি হয় যাদের রাজধানী তৈরির দরকার হতে থাকে। যেমন চণ্ডীগড়ের কথাই ধরা যাক, পঞ্জাব দুভাগ হয়ে যাবার ফলে লাহোর পাকিস্তানের আওতায় পড়ে, ফলে পঞ্জাবের নতুন রাজধানী শহরের প্রয়োজন দেখা যায়। যা থেকেই ক্রমশ চণ্ডীগড়ের পরিকল্পনা। আবার ওড়িশা রাজ্যে কটকের উপর চাপ এতই বেশি ছিল যে ভুবনেশ্বরের পরিকল্পনা করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। পশ্চিম পঞ্জাবের মতো একইভাবে দেশভাগের ফলে পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর আগমন ঘটে। কলকাতায় বিভিন্ন স্থানে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে উঠতে থাকে, তাই তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায় এই বিপুল শরণার্থী সমস্যার মোকাবিলা করতে কলকাতার অদূরে নতুন পরিকল্পিত নগরীর কথা ভাবেন। যা পঞ্চাশের দশকের শেষে 'কল্যাণী'-র রূপ নেয়। এরপর কলকাতার জনসংখ্যার চাপ আরও কমানোর জন্য তৈরি হয় সল্টলেক। এছাড়া স্বাধীনোত্তর কালে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যখন ভারী শিল্পের গুরুত্ব বাড়ে তখন দুর্গাপুর, বোকারো-র মতো শিল্পনগরীও গড়ে তোলা হয় যেখানে শিল্পকে কেন্দ্র করে বসতি ও অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরি হয়।

আজকালও দেখা যায় যে বড় বড় মেট্রোপলিটন শহরগুলোর বর্ধিত চাপ কমানোর জন্য কাছাকাছির মধ্যে নিউটাউনের মতো শহর গড়ে তোলা হয় যেগুলো 'Countermagnet' রূপে কাজ করে। যেমন—মুম্বইয়ের অদূরে নভি মুম্বই, রায়পুরের কাছেই নয়া রায়পুর ইত্যাদি। মূলত উপনগরীগুলোকে বসতি শহর হিসাবেই ভাবা হয়। তবে নতুন শিল্পনীতির (১৯৯১) পর থেকেই দেশে বিশ্বায়ন আর বেসরকারিকরণের পরিস্থিতি তৈরি হলে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের গুরুত্ব বেড়ে হাওয়ায় নতুন শহরে এই ধরনের দূষণহীন শিল্পতালুক গড়ে তোলারও ব্যবস্থা রাখা হয়। যেমন—কলকাতা সংলগ্ন সাম্প্রতিক রাজারহাট নিউটাউন, এখানে সমস্ত বিদেশি তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে জমি দেওয়া হয়েছে এবং একটি আন্তর্জাতিক মানের পরিকল্পিত নগরী গড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দিল্লির নয়ডাও প্রায় ২০০ বর্গকিমি স্থান জুড়ে গড়ে ওঠা সাড়ে ছয় লাখ জনসংখ্যা সহ ভারতের অন্যতম তথ্যপ্রযুক্তি নগর, যা দিল্লির অন্যতম উপনগরীও বটে। সাম্প্রতিককালে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর পরিবেশের দিক বজায় রেখে একেবারে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও কিছু ছোট শহর তৈরি করা হয়েছে, যেমন—ভারতের সর্বপ্রথম পাহাড়ি পরিকল্পিত শহর লাভাসা, এছাড়াও অ্যাম্বিভ্যালি ইত্যাদি।

চণ্ডীগড়

ভারতের প্রথম আর পূর্ণ পরিকল্পিত সব থেকে সুন্দর রাজধানী শহর হল চণ্ডীগড়। পাকিস্তান থেকে পৃথক হবার পরই যখন রাজধানী শহরের জন্য কোনও পরিকল্পনাই যখন পুরানো শহরগুলোর পরিবর্তনে খাপ খাচ্ছিল না তখনই নতুন নগর পরিকল্পনা করা হয়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর স্বপ্ননগরী চণ্ডীগড়কে পঞ্জাব ও হরিয়ানা দুই রাজ্যেরই যৌথ রাজধানী ঘোষণা করা হয়। শিবালিকের পদতলে তৈরি এই শহর বিখ্যাত সেরা architectural (নির্মাণ কৌশল সংক্রান্ত) পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য। বিখ্যাত প্ল্যানার লি করবিসুয়ের তার 'Radiant City'-র ধারণাকে সার্থক করেছেন চণ্ডীগড়ের রূপায়ণের মাধ্যমে। সত্যিই ভারতের আধুনিক নগর পরিকল্পনার উদাহরণ চণ্ডীগড়। একে ৪৭টি সেকটরে (এক একটি সেকটর ৮০০×১২০০মি.) ভাগ করে প্রত্যেকটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে তুলনা করে শহরের প্রতিটি বিষয়কে দেখা হয়েছে। যেমন—ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স (মাথা), শিল্পাঞ্চল (হাত) হৃৎপিণ্ড (সিটি সেন্টার), ফুসফুস (সব সবুজ আর খোলা স্থান) বিভিন্ন রাস্তা (শিরা উপশিরা) ইত্যাদি। একে তিনটে পর্যায়ে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়।

এহেন 'City Beautiful'-এও বেশ কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে। যেমন বর্তমানে শহরের জনসংখ্যা প্রায় ১০ লাখের কাছাকাছি যার থেকে অনেক কম মানুষের জন্য এটি পরিকল্পিত হয়েছিল। তাছাড়া ২০০১ থেকে ২০১১-এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক বেশি। শহরের চারপাশে গড়ে ওঠা অপরিকল্পিত ছোট ছোট বসতি আর শিল্পক্ষেত্রগুলো একটা বড় সমস্যা সৃষ্টি করছে কারণ এরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিষেবার জন্য চণ্ডীগড়ের উপরই পুরোপুরি নির্ভর করে, তাই মূল শহরের উপর চাপ বেড়ে চলেছে। আর প্রথম থেকেই দুটো রাজ্যের রাজধানী হওয়ায় প্রত্যাশা পূরণের রাজনৈতিক চাপ তো আছেই। এছাড়া এখানে ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'Zonal approach' পদ্ধতি ব্যবহার করায় প্রতিটি বসতি সেকটর একে অপরের প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে মূল শহরের ভুমি ব্যবহারের একঘেয়েমি দেখা যায়। তার সঙ্গে এদের পৃথক করার জন্য উপযুক্ত 'Capital Complex'-এরও অভাব আছে। আর 'Landmark'-এর অবস্থান একে শহরের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন আর স্বতন্ত্র করে রেখেছে বলেও অনেক অসুবিধা দেখা যাচ্ছে।

গান্ধীনগর

যখন ১৯৬০ সালে গুজরাত রাজ্যকে পূর্বতন বোম্বে থেকে আলাদা করা হল তখন আমেদাবাদই গুজরাতের রাজধানী শহর হবার জন্য নির্বাচিত ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা করা সম্ভব না হওয়ায় এর থেকে ৩২ কিমি দূরে একটা নতুন শহরের পরিকল্পনা করা হয় যাকে মহাত্মা গান্ধী নামানুসারে গান্ধীনগর নাম দেওয়া হয় প্রায় চণ্ডীগড়ের মতোই সেকটর অনুযায়ী প্রায় জনবসতিহীন জমিতে সুপরিকল্পনার মাধ্যমে শহর তৈরি করা হয়

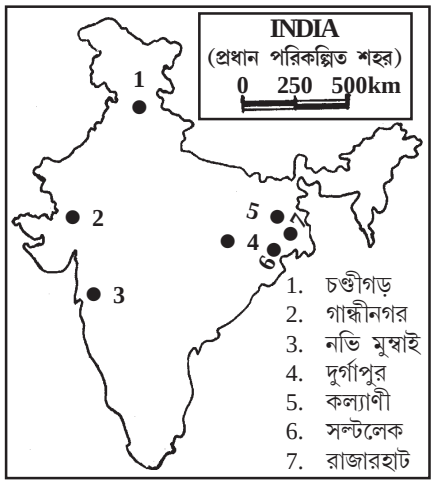

১৯৬৫-৭০ সালের মধ্যে। আর গুজরাতের প্রশাসনিক কার্যালয়ও এখানে সরিয়ে নেওয়া হয়। তিরিশটা পৃথক সেকটরে সরকারি অফিস, বসবাসের আবাসন ও ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, পার্ক, জলাশয় নির্মিত হয়। এর সুন্দর পার্কগুলো পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। আশির দশকে এই শহরের দ্রুত বৃদ্ধি হতে থাকে। এখানে ইলেকট্রনিক শিল্প গড়ে ওঠায় তা শহরের বৃদ্ধিতে ইন্ধন জোগায়। সবরমতী নদীর পশ্চিম তীরে গড়ে ওঠা এই শহরে বর্তমানে ২ লাখেরও বেশি লোক বাস করে। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এর চারপাশের প্রায় ৩৯টা গ্রাম অধিগ্রহণ করায় একে জেলার স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বর্তমানে গান্ধীনগর শহরকে আর বিস্তৃতির মাধ্যমে পুনরায় নতুন পরিকল্পনার আওতায় আনা হচ্ছে। আর এইখানেই একটা নতুন বিতর্ক দানা বাঁধছে। এই শহরের আগের মাস্টার প্ল্যানের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির জন্য উত্তর পশ্চিমে ৩০টা সেকটর বাড়াবার কথা ভাবা হয়েছিল পূর্বে সবরমতী নদী ও উত্তরে শিল্পাঞ্চল থাকায়। এতে প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ মানুষের বসবাসের সংস্থানের পরিকল্পনাও ছিল। কিন্তু নতুন যে প্ল্যান করা হয়েছে তাতে শহরের স্বাধীন অস্তিত্বই নষ্ট হয়ে গিয়ে এটা আমেদাবাদের একটা শহরতলিতে পরিণত হতে চলেছে। কারণ এতে আগের প্ল্যান বাতিল করে উত্তর পশ্চিমের বদলে দক্ষিণে আমেদাবাদের দিকেই প্রসারিত করার চেষ্টা চলছে। কারণ বর্তমানে এই দুই শহরের মাঝখানের জমির একটা বড় বাজারদর দেখতে পাচ্ছে পরিকল্পনাকারীরা যা খুব সহজেই বেসরকারি ব্যক্তিগত ডেভেলপারের হাতে তুলে দেওয়া যাবে বলে তাদের ধারণা। তাই মুনাফাই বর্তমানে শহর প্রসারণের দিক ও মাত্রা নির্ধারণ করেছে, যাতে পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র, মূল শহরের অস্তিত্ব সবকিছুই মূল্যহীন। শহরটাই দক্ষিণে বিস্তৃত হলে ক্রমশ আমেদাবাদের সঙ্গে নিলে যাবে নিজস্ব অস্তিত্ব ছাড়া। এর ফলে শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান 'সেন্ট্রাল ভিস্তা' পুরোপুরি ধ্বংস হবে। এছাড়া এর দক্ষিণে ৫ কিমি লম্বা আর এক-চতুর্থাংশ কিমি চওড়া যে জমি বাণিজ্যিক

তালিকা-২

বিষয়	ফেজ-১	ফেজ-২	ফেজ-৩
জনসংখ্যা	১,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	৫ লাখের বেশি
সেকটর	১-৩০	৩১-৪৭	৪৮-৫৬
আয়তন	৪৩ বর্গকিমি	৭০ বর্গকিমি	৪৪ বর্গকিমি

কাজকর্ম আর বসতির জন্য রাখার প্রস্তাব হয়েছে, তাতে শহরের উপকণ্ঠের প্রায় ৬০০০ একর সবুজ আচ্ছাদনও নষ্ট হবে, যেখানে মূল শহরের প্রায় ৫০ শতাংশ বাণিজ্যিক প্রয়োজনে নির্ধারিত জমি এখনও অবিক্রীত। শুধু তাই নয় শহরের ভিতরেও পরিবর্তন করা হচ্ছে। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য নির্মিত সেকটর ১৭কে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মূল প্ল্যানে প্রধান রাস্তাগুলোর সংযোগস্থলের ফাঁকা জমিতে বর্তমানে রাস্তার দুপাশের দোকান আর কিছু ঘর বানিয়ে তাকে প্রায় বস্তির মতো চিত্রায়িত করা হতে চলেছে। এভাবে শহরের মৌলিক 'আরবান ডিজাইন' পরিবর্তিত হলে শহরের মৌলিকত্ব নতুন প্ল্যানে কতটা থাকবে সেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

নভি মুম্বই

মহারাষ্ট্রে সত্তরের দশকে গড়ে ওঠা এই শহরকে পৃথিবীর বৃহত্তম পরিকল্পিত শহর (৩৪৪ স্কোঃ কিমি) বলা হয় যা রাজধানী মুম্বই-এর পরিবর্ত ও পরিপূরক রূপেই গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়। ১৯৬৬ সালে মহারাষ্ট্র রিজিন্যাল অ্যান্ড টাউন প্ল্যানিং অ্যাক্ট-এর দ্বারা নিউটাউন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি থানে জেলার ৪৪টা গ্রাম নিয়ে সত্তরের দশকের শুরুতেই এর পত্তন ঘটে। স্থপতি চার্লস কোরিয়া ও তার সহযোগীদের উদ্যোগে পশ্চিমঘাট পর্বত আর আরবসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে মুম্বই শহরের ২৫ কিমি দূরে গড়ে ওঠে এই শহর। বহু শিল্পের আগমনের জন্য এর পরিকাঠামোও অনেক উন্নত করা হয়। ৪-৫ মিলিয়ন মানুষের জন্য পরিকল্পিত এই শহরে বর্তমানে প্রায় ১১ লক্ষ লোকের বসবাস। পুরো শহরের ৬০ শতাংশ এখনও পর্যন্ত উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। এর প্রায় ১০০ বর্গকিমি অঞ্চলই সিআরজেড-এর আওতায় পড়ে অর্থাৎ বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকেই স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৪টি স্বয়ংসম্পূর্ণ হাব (এক একটি ৭৫০-২৫০০ হেক্টর) ও একটি সিবিডি-সহ একটা শিক্ষা হাবও তৈরি করা হয়েছে। এর কাছেই ভারতের সহচেয়ে বড় ও আধুনিকতম বন্দর নভসেবা অবস্থিত। এখন এখানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আর এসইজেড-ও গড়ে তোলা হচ্ছে। এই শহরে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনায় ভূমি ব্যবহারে 'জুনিং'-এর উন্নয়নের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে এই মডেলে প্রতিটি ভূমি ব্যবহারের পূর্ব নির্ধারিত স্থান আর অনুমতি অনুযায়ী গড়ে তোলা হয়। এককেন্দ্রিকের বদলে বহুকেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে চিহ্নিত হয়। যাতে মুম্বই-এর মতো একই স্থানে সবকিছু একসঙ্গে গড়ে উঠে সমস্যা না বেড়ে যায়। কিন্তু তবুও কিছু সমস্যা তো থেকেই যায়। কারণ ১৯৭২ সালে খুব উৎসাহের সঙ্গে শুরু হলেও শহরের উন্নতি খুবই ধীর গতিতে চলতে থাকে। তাই যেরকম সাফল্যের কথা ভাবা হয়েছিল আদপে তার কিছু ঘটেনি। তাই মুম্বই-এর বিকল্প শহর রূপে নভি মুম্বাই স্বীকৃতি পায়নি, তাছাড়া মুম্বই-এর অন্যান্য অঞ্চলের বৃদ্ধি ও নভি মুম্বইয়ের বৃদ্ধির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। আর বর্তমানে এখানে বিমানবন্দর বিষয়ে দীর্ঘদিন বিতর্ক চলছে পরিবেশগত সমস্যার কারণে। প্রায় ১৩ বছর লেগেছে বিমানবন্দর তৈরির জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে। ৯০০০ কোটি টাকার প্রকল্প বর্তমানে বেড়ে ১৫০০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। এই বিতর্কের মূলে রয়েছে বিমানবন্দরের জন্য নির্ধারিত স্থানের ১০ কিমি-এর মধ্যে অবস্থিত ভারতের অন্যতম পক্ষী অভয়ারণ্য কার্নালা যা ১৪৭ ধরনের ভারতীয় আর ৩৭ ধরনের পরিযায়ী পাখির আস্তানা। বিমানবন্দরের নির্মাণ এই অভয়ারণ্যকে অচিরেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। শুধু

তাই নয়, এই এলাকা সিআরজেড-এর অধীনে আর ১৯৯১ সালের সিআরজেড আইন ও এই বিমানবন্দর তৈরি সমর্থন করে না। তাই উন্নয়নের স্বার্থে আইনেও কিছু সংশোধন করা হয়েছে এর সঙ্গে স্থানীয় নদীর জলপ্রবাহের পরিবর্তন। উপকূলের ৪০০ একর ম্যানগ্রোভ অরণ্য নষ্টের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পিত শহর— একটি মূল্যায়ন

স্বাধীনতার পর ১৯৬৬ সালে কলকাতার বেসিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান-এ নতুন শহর তৈরির জন্য দুধরনের নীতি গ্রহণ করা হয়। প্রথমত— উপনগরী তৈরি যার ফলশ্রুতি হিসাবে কল্যাণী গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়— প্রসারিত শহরাঞ্চল যার ফলে সল্টলেক তৈরি হয়। তদানীন্তন দূরদর্শী মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায় অনুধাবন করেন যে দেশভাগের ফলে কলকাতায় আসতে থাকা শরণার্থীদের চাপ কমানোর জন্য নতুন বসতিস্থান নির্বাচন অনিবার্য। তাই জন্যই প্রথমে কল্যাণী ও পরে সল্টলেক তৈরি হয়। এছাড়া দুর্গাপুর গড়ে ওঠে ইস্পাতকেন্দ্রসহ শিল্পনগরী হিসাবে।

কলকাতা থেকে প্রায় ৫০ কিমি দূরে শিয়ালদহ-কল্যাণী রেলপথের পশ্চিম আর গঙ্গার পূর্বে কল্যাণী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিত্যক্ত রুজভেল্ট নগরীর উপর। আর এখানে মূলত আসতে থাকে সদ্য পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু মানুষ যাদের আগমন অব্যাহত থাকে ১৯৭১ -এর বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পরও। তাছাড়া মূল পরিকল্পিত অংশে জমি বাড়ি কিনে বসবাস করতে থাকে কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত মানুষ। এখানে এ, বি, সি, ও ডি চারটে অংশে যথাক্রমে প্রথম দুটিতে বসতি, তারপর শিক্ষাকেন্দ্র ও শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হয়। এ ও বি-কে ৫-১০ কাঠা জমিযুক্ত কতকগুলো ছোট ছোট সাবপ্লটে ভাগ করে জমি লিজে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে পয়ঃপ্রণালী, জলনিষ্কাশন, রাস্তাঘাট, সবুজায়ন সবই তৈরি হয়। শহরে প্রায় ৫৫টা পার্ক তৈরির মাধ্যমে পরিবেশের উপরও নজর রাখা হয়। কিন্তু আশির দশক থেকেই এখানে গড়ে ওঠা বহু ছোট বড়, মাঝারি শিল্প ক্রমশ নানা কারণে রুগ্‌ণ ও বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। ফলে কল্যাণীর শিল্পনগরী হিসাবে সুনাম তো নষ্ট হলই তার সঙ্গে এর বৃদ্ধিও স্থগিত হয়ে যায়। এখান থেকে পরিব্রাজন ক্রমশ বাড়তে থাকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি কারণে আর শহরটা ধীরে ধীরে বয়স্ক মানুষদের অবসরকালীন আস্তানায় (রির্টায়ারমেন্ট টাউন) পরিণত হয়। বহু জমি বাড়িও ফাঁকা পড়ে থাকে। এর সঙ্গে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ বস্তিবাসী দরিদ্র মানুষ যারা প্রায় ৫২টা ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা কলোনিতে বসবাস করে শহরের মধ্যে আর প্রান্ত অঞ্চলে। এদের বাসস্থান, জল, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা পৌরসভাকে করতে হয় যা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে এসবের উন্নতির দ্রুত চেষ্টা চলছে এবং এই কাজে পৌরসভা অনেকটাই সফল বলা যায়। তবে কল্যাণীতে নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে অজস্র জমিতে ফ্ল্যাট তৈরি হওয়ার কারণে। লিজ জমি নানা প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরিত হয়ে চার-পাঁচতলা ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। শহরে পা ফেলতেই প্রায় প্রতিটি ব্লকেই (এ ও বি) ছোট ছোট বাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে অগুনতি ফ্ল্যাট। ফলে অল্প স্থানে বেশি লোক বসবাস করায় শহরের পরিকাঠামোর উপরও চাপ বেড়ে চলেছে। তাছাড়া মূল শহরের পরিকল্পনায় কিছু খামতি আছে। যেমন গোটা শহরে কোনও বিনোদনের ব্যবস্থা নেই। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থাও অপ্রতুল। কলকাতার সঙ্গে দৈনিক সংযোগের ক্ষেত্রে রেলই প্রধান মাধ্যম। বর্তমানে সরকারিভাবে এখানে 'এইমস' তৈরির ঘোষণা হওয়ায় বলা যায়, এখানে পড়ে থাকা অব্যবহৃত জমিতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা রুগ্‌ণ শহরের পুনরুজ্জীবনের কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

এবারে আসা যাক পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গর্ব সুন্দর শহর সল্টলেকের কথায় যা পরে বিধাননগর নামকরণ করা হয়। ষাটের দশকে পূর্ব কলকাতার বিদ্যাধরী নদীর পৃষ্ঠ জলাভূমির কিছু অংশকে গঙ্গার পলি দিয়ে ভরাট করে যুগোস্লোভিয়ান পরিকল্পনাকারীদের আধুনিক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রায় ১২.৫ বর্গকিমি স্থান জুড়ে এই উপনগরী গড়ে তোলা হয়। যা কলকাতা সংলগ্ন এক 'স্বপ্ননগরী', এখানে মাস্টার প্ল্যানে ৫০ শতাংশ বসতি এলাকার পাশাপাশি ২৩ শতাংশ রাস্তাঘাটের জন্য বরাদ্দ ছিল যা কলকাতা বা অন্যান্য শহর থেকে অনেকটাই বেশি, তাই এখানকার রাস্তাও অনেক চওড়া আর সংখ্যায় বেশি। আধুনিক পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায় রাস্তার দুপাশের সবুজায়ন, অনতিউচ্চ বাড়িঘর, বড় খেলার মাঠ, ভূগর্ভস্থ জলনির্গম ও পয়ঃপ্রণালী, পৃথক পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ এক (চণ্ডীগড়ের ন্যায়) ইত্যাদি ব্যবস্থাতেও বিধান রায়ের এই স্বপ্ননগরী কলকাতার প্রশাসনিক, শিক্ষাগত চাপ অনেকটাই কমাতে পেরেছে কারণ মূল শহর থেকে অনেক অফিস, শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি এখানে সরিয়ে আনা হয়েছে। এখানে বর্তমানে ২ লাখের বেশি মানুষের বসবাস আর তার সঙ্গে কয়েক হাজার ভাসমান জনসংখ্যা (Floating Population) পাঁচ নম্বর সেকটরে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কাজ করতে আসে। তাই কল্যাণী বা দুর্গাপুরের চেয়ে সল্টলেক অনেক বেশি সফল। কিন্তু চাঁদের কলঙ্কের মতোই ছোট ছোট সমস্যা এই শহরেও জড়িয়ে আছে। মধ্যবিত্ত বাঙালির জন্য গড়ে তোলা এই শহরের অনেকটাই এখন উচ্চবিত্ত অবাঙালি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দখলে চলে গিয়েছে। বেআইনি জমি বাড়ির হস্তান্তরের মাধ্যমে। তাই নানা স্থানে সাংস্কৃতিক ভেদাভেদটাও খুব স্পষ্ট যা নগরের চরিত্রেও পরিবর্তন আনছে। তাছাড়া এখন সবই বহুতল বাড়ি তৈরি হচ্ছে যা শহরের মূল পরিকল্পনার পরিপন্থী এবং পৌরসভার নিয়ম বিরুদ্ধ। অত্যধিক দাম পাবার আশায় বয়স্ক বাঙালি দম্পতিরা তাদের পুত্রকন্যা শহরের বাইরে পাড়ি দিলেই অবাঙালিদের হাতে এই লিজ সম্পত্তি তুলে দিয়ে নিজেরা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। গত বছরই দীর্ঘদিনের এই বেআইনি কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য নতুনভাবে হস্তান্তরের ব্যবস্থা চালু হয়েছে কিন্তু ততদিনে প্রায় ৩৫ শতাংশ প্লটই হস্তান্তর হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যেমন, মেট্রো রেল ও স্টেশন নির্মাণ, স্থায়ী মেলাকেন্দ্র, স্পোর্টস

কমপ্লেক্স তৈরি এসবের কোনও অনুমোদন মাস্টার প্ল্যানে ছিল না। আর এসবের সঙ্গে শহরের মধ্যে আর সংযুক্ত এলাকায় গড়ে ওঠা বস্তির সমস্যা তো আছেই যারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছে আর অনেক ক্ষেত্রে ঠিকঠাক পরিষেবাও পাচ্ছে না। আর এই বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ পড়ছে পরিকাঠামো আর পরিষেবার উপর, যেমন—আগে কখনও না হলেও এখন সল্টলেকে বর্ষা হলেই জল জমছে, যত্রতত্র ছড়াচ্ছে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর মতো রোগ। তাই শহরের সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি এসব সমস্যার প্রতিও দৃকপাত করা জরুরি।

সবশেষে পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক নব্যনগরী রাজারহাটের কথা আলোচনা করা যায়। কলকাতার বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য আর উদীয়মান তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সংস্থানের জন্য সল্টলেকের উত্তরপূর্বে এর প্রায় ৩ গুণ বেশি স্থান জুড়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রায় ৩০টা মৌজা নিয়ে নব্বই দশকের শেষে রাজারহাট-নিউটাউন শহরের পরিকল্পনা করা হয়। এইচআইডিসিও সংস্থাকে এর পরিকাঠামো ও নকশা তৈরির ভার দিয়ে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে একটা নতুন আন্তর্জাতিক মানের শহর তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। তিনটে অ্যাকশন এরিয়া ও একটি কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক অঞ্চল সহ বিনোদন, ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প সব মিলিয়ে পরিবেশবান্ধব দূষণমুক্ত নগরীর প্ল্যান করা হয়েছে। এখনও দ্বিতীয় ও তৃতীয় অ্যাকশন এরিয়ার কাজ চলছে, প্রায় ১০ লাখ মানুষের জন্য গড়ে তোলা এই শহরে 'রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট'-এর রমরমা প্রথম থেকেই দেখা যাচ্ছে। বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি হয়েছে অজস্র হাউজিং এস্টেট যেখানে অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষেরা বসবাস করছে আধুনিক সুযোগসুবিধাসহ। শহর তৈরি সম্পূর্ণ না হলেও সমস্যা প্রথম থেকেই রয়েছে। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত রাজনৈতিক বিতর্কের মাধ্যমে যার সূত্রপাত। এই বিতর্ক বহুদিন বহুদূর গড়িয়েছে। তাছাড়া এ শহরে 'রিয়েল এস্টেট' যতটা বাড়বাড়ন্ত, ততটা বসবাসকারী মানুষদের পানীয় জল, বিদ্যুৎ, পয়ঃপ্রণালী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সাধ্যের মধ্যে চিকিৎসা বা বাজারের মতো পরিষেবা সাফল্য পায়নি, বরং এসব নিয়ে মানুষের অসন্তোষ রয়েছে। সামান্য জিনিস কেনার জন্যও এখানে শপিং মল ছাড়া গত্যন্তর নেই। যদিও বিনোদনের ক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকা আছে তবু দৈনিক চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয় বাজার ইত্যাদি বসবাসের ন্যূনতম পরিষেবার অভাব এখনও মানুষের নিত্যসঙ্গী। তাই আন্তর্জাতিক মানের নগরী গড়ে তোলার ব্যাপারে মনোযোগী হলেও অধিবাসীদের প্রয়োজনের দিকে দ্রুত নজর দেওয়া প্রয়োজন।

নগর পরিকল্পনার পরিবর্তিত ধরন

তালিকা-৩ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে পরিকল্পিত শহরগুলোতেও জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে আর সেইজন্যই এই শহরগুলোও নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। তাছাড়া প্রতিটা শহরেই মাস্টার প্ল্যানে দরিদ্র মানুষদের জন্যে কোনও পজিশন না থাকায় পরবর্তীকালে বস্তি সমস্যা তৈরি হয়। এমনকী এদের জন্য উন্নয়নমূলক কাজও ব্যাহত হয়। তেমনই বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য মূল পরিকল্পনায় বহু পরিবর্তন আনতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিকল্পিত শহরের ভূমি ব্যবহারের লক্ষণীয় পরিবর্তনও ঘটে। যেমন— বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র শহরে পরিণত হলে গ্রাম্য ভূমিচিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে নগর পরিকল্পনার ধরন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে। সাধারণত জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে নতুন শহর তৈরির পরিকল্পনা বেশি বাস্তবায়িত হচ্ছে কারণ আগের মতো ফাঁকা জমি বা পরিত্যক্ত জমির সন্ধান মিলছে না। এর ফলে কৃষি উৎপাদনের বা কৃষকদের পরিবর্ত জীবিকার সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এছাড়া তাদের পুনর্বাসনের সমস্যা তো আছেই, এছাড়া পরিকল্পিত শহরের বসতি এলাকার ভূমিব্যবস্থারও পরিবর্তিত হচ্ছে। আগের জমি, বাড়ির ধারণা বদলে এখন 'এস্টেট টাউনশিপের' ধারণা চালু হয়েছে যেখানে এক স্থানে অনেক মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা হচ্ছে। এর ফলে একই শহরের মধ্যে ছোট ছোট পৃথক বসতি এলাকা তৈরি হচ্ছে যা 'গেটেড কমিউনিটি' নামে পরিচিত। এর ফলে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো লাভবান হচ্ছে।

এখানে মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সবরকম অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদের জন্যই বসবাসের সংস্থান হচ্ছে। তবে সবক্ষেত্রেই দরিদ্র মানুষরা ব্রাত্যই থাকছে, তাদের পুনর্বাসনও সীমিত ও নগণ্য। ফলে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এইসব শহরের উচ্চ বা মধ্যবিত্ত মানুষদের পরিষেবা দেবার জন্য জীবিকার তাগিদে ছুটে আসা মানুষদের বসবাসের পরিকল্পনা না করলে তাদের ব্যবস্থা কোথায় হবে? আর যারা পরিকল্পনাকারী তারা কি আদৌ শহরের চরিত্র আর পরিবর্তিত চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক ডাটা সংগ্রহ করছে—যা বিদেশের অনুকরণে শুধুই ছবির মতো সুন্দর ভূমিচিত্র গড়ে তুলে 'থিংক গ্লোবাল, অ্যাক্ট লোকাল' স্লোগানকে সফল করার চেষ্টা করছে। বর্তমানে নগরায়ণের হার দেখে বলা যায় ভবিষ্যতের বিপুল জনসংখ্যার একমাত্র বাসস্থান হতে পারে আরও নতুন পরিকল্পিত নগরী যেখানে মূল মেট্রোপলিটন শহরের সমস্যাগুলো অনেকটাই এড়ানো যায়, নাগরীয় পরিষেবা উন্নতমানের দেওয়া যায় পরিবেশ বজায় রেখে। তাই পরিকল্পিত নগরীর সাফল্য শুধু গগনচুম্বী অট্টালিকা, প্রশস্ত রাস্তা, সবুজায়ন বা উন্নত পরিকাঠামোর মধ্যেই থাকে না, বরং সার্বিক সুসংহত উন্নয়নের রূপায়ণের মাধ্যমেই তা সার্থক করা সম্ভব।❑

তালিকা-৩
প্রধান পরিকল্পিত শহরগুলির জনসংখ্যার পরিবর্তন

সাল	নভি মুম্বই	চণ্ডীগড়	গান্ধীনগর	রাজারহাট	সল্টলেক	কল্যাণী
২০০১	৭,০৩,৯৪৭	৯,০০,৬৩৫	১,৯৫,৯৮৫	২,৭১,৮১১	১,৬৭,৮৪৮	৮১,৯৫২
২০১১	১১,১৯,৪৭৭	৯,৬০,৭৮৭	২,০৮,২৯৯	৪,০২,৮৪৪	২,১৫,০০০	১,০০,৬২০

সূত্র : Census of India.

দেশের শহরগুলির জন্য অর্থসংস্থানের নিয়মিত ব্যবস্থা

নিজস্ব সহায় সম্পদের অভাবে ধুঁকছে এদেশের পৌরসভাগুলি। পৌরসভাগুলির নিজস্ব রাজস্বের যে দুটি প্রধান উৎস সম্পত্তি কর এবং গ্রাহক মূল্য সেগুলির আদায়ও শোচনীয়ভাবে কম। এদেশে সম্পত্তি করের পরিমাণ জিডিপি-র মাত্র ০.২০ শতাংশ। অথচ ভারতের সমগোত্রীয় উন্নয়নশীল অর্থনীতি বা ট্রানজিশনাল ইকোনমিগুলির অবস্থা অনেক ভালো। জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থার মতো পরিষেবার জন্য গ্রাহক মূল্য আদায়ের হালও তথৈবচ। এর জন্য শুধু সরকারি নিয়ন্ত্রণকে দায়ী করলে চলবে না, পৌরসভাগুলির দক্ষতার অভাবও সমানভাবে দায়ী। পৌরসভাগুলির ভাঁড়ার এভাবে শূন্য হয়ে পড়লে নাগরিকদের কাছে ন্যূনতম মৌলিক পরিষেবাটুকুও পৌঁছে দেওয়া দুরূহ হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় পৌরসভাগুলির সামনে অর্থসংস্থানের বিকল্প কোনও পন্থা রয়েছে কি? থাকলেও সেগুলির সুবিধা কীভাবে নিতে পারবে পৌরসভাগুলি—আলোচনা করেছেন **আনন্দ সহস্রনামন** *এবং* **বিষ্ণু প্রসাদ।**

ভারতের পৌরসভাগুলিতে কাজ এবং অর্থের জোগানের মধ্যে বরাবরই একটা ব্যবধান রয়ে যায়। নিজস্ব ব্যয়নির্বাহের জন্য রাজস্ব আদায়ের উপযুক্ত এবং যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই দেশের শহরগুলিতে। ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে কাজকর্মের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে অনেকাংশে স্বশাসন দেওয়া হলেও, এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক স্বশাসন দেওয়া হয়নি। ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী অনুযায়ী পৌরসভাগুলির যে ১৮টি দায়িত্ব পালনের কথা, তার মধ্যে অর্ধেকেরও কম কাজের ক্ষেত্রে আয়ের উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের প্রকাশ্য সম্মতি ছাড়া করের হার নির্ধারণ বা কর আদায়ের ভিত্তি পরিবর্তন করতে পারে না। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির আর্থিক স্বশাসন সংকুচিত করতে রাজ্য সরকারগুলি অনেক সময় নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে পৌরসভাগুলির জন্য বিকল্প রাজস্বের ব্যবস্থা না করেই গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বের উৎস বন্ধ করে দিয়েছে এমন প্রমাণও রয়েছে। যেমন, ধরা যাক রাজস্থান ও হরিয়ানার কথা। রাজস্থান ও হরিয়ানা সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির সঙ্গে কোনওরকম আলাপ-আলোচনা না করেই সম্পত্তি করের বিলোপ ঘটিয়েছে। আবার, পঞ্জাব সরকারও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করেই সম্পত্তি করের নিম্নসীমা এতটাই বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি করের আওতা থেকে বেরিয়ে গেছে। তবে দেশের পৌরসভাগুলির অর্থসংস্থানের যাবতীয় সমস্যার জন্য সরকারের উঁচু মহলকে দায়ী করে লাভ নেই। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে যে কর বা মূল্য আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতারও যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে পারেনি সংস্থাগুলি, বিশেষ করে, কর আদায়ের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। যেমন ধরা যাক, ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন হিসেব করে দেখেছে এদেশে সম্পত্তি কর আদায়ের দক্ষতা মাত্র ৩৭ শতাংশ যা রীতিমতো এক শোচনীয় পরিসংখ্যান। দেশের শহরগুলিতে নিজস্ব উৎসগুলি থেকে রাজস্ব আদায় এত কম হয় যে পৌরসভাগুলি নাগরিকদের কাছে মৌলিক জনপরিষেবাগুলি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে না। হায়দরাবাদের কথাই ধরা যাক। এ শহরে ৪০ শতাংশ মানুষের বাড়িতে সরাসরি জলের সরবরাহের লাইন নেই। আবার বেঙ্গালুরুর ৫০ শতাংশ বাড়িতে কোনও নিকাশি বন্দোবস্ত নেই। ভারতের নগর নীতিতে বরাবরই বড় বড় মহানগরগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের ছোট ও মাঝারি শহরগুলিতে সরকারি পরিকাঠামো এবং পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। কর্ণাটকের ছোট্ট শহর শ্রীরঙ্গপটনা-তে ৩৯ শতাংশ মানুষের কাছে এখনও আবর্জনা সংগ্রহ পরিষেবা পৌঁছয়নি, সড়ক নেটওয়ার্কের নির্মাণের কাজ এখনও প্রায় ৫১ শতাংশ বাকি।

বড় শহর হোক বা ছোট শহর এবার যে প্রশ্নটি উঠে আসে সেটি হল : আগামী ১৫ বছরে বেঁধে মান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের জন্য পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করতে এবং সরকারি পরিকাঠামোর উন্নয়নের শহরগুলি কীভাবে দীর্ঘমেয়াদি ও নিয়মিতভাবে অর্থের সংস্থান করবে?

শহরগুলির জন্য অর্থ সংস্থানের উৎস

পৌরসভাগুলির রাজস্বের দুটি উৎস আছে যথা—পৌরসভার নিজস্ব রাজস্ব এবং হস্তান্তরিত রাজস্ব। কর বা বিভিন্ন মূল্য ধার্য করার মাধ্যমে পৌরসভাগুলির যে রাজস্ব আদায় হয় তাকে পৌরসভাগুলির নিজস্ব রাজস্ব বলে যেমন, সম্পত্তি কর, জলের ওপর ধার্য মূল্য। সরকারের উচ্চমহলের পক্ষ থেকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে যেসমস্ত রাজস্ব হস্তান্তরিত করা হয় সেগুলিকেই হস্তান্তরিত রাজস্ব বলা হয়—যেমন, রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ করা

অর্থের বিনিময়ে কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমেও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির অর্থের সংস্থা হতে পারে—যেমন জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প (এনআরইজিএ) বা রাজ্যস্তরের আবাসন প্রকল্পসমূহ।

এদেশে শহরের পরিকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্য বর্তমানে সবার আগে দুটো কথা মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত, পরিকাঠামো ও পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থায় যে বকেয়া কাজ রয়েছে তা আগামী ১৫ বছরে যথাযথভাবে শেষ করতে হবে এবং এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত পরিকাঠামোর চাহিদাও পূরণ করতে হবে। ভারতের নাগরিক পরিকাঠামো এবং পরিষেবা সম্পর্কিত প্রতিবেদনে (২০১১) হিসেব করে দেখানো হয়েছে যে ২০১২ থেকে ২০৩১—এই কুড়ি বছরে নাগরিক পরিকাঠামোর জন্য ভারতের শহরগুলিতে ৪০ লক্ষ কোটি টাকা (২০০৯-১০ সালের মূল্যের ভিত্তিতে) বিনিয়োগের প্রয়োজন। ব্যাংকের অনুদানের ওপর নির্ভরশীল শহরগুলির (ব্যাংকরোলিংসিটি) পাশাপাশি জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর নবীকরণ মিশন (জেএনএনইউআরএম)-এর মতো প্রকল্পগুলি সরকারেরও উচ্চস্তরে যথেষ্ট আর্থিক বোঝা চাপিয়েছে। যে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে আর্থিক হাল সে কথা বিবেচনা করে বলা যায় যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ওপর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির অতিরিক্ত নির্ভরতা এককথায় ক্ষতিকর।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানীয় কর ও মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে এদেশের শহরগুলিকে অতি অবশ্যই নিজস্ব রাজস্ব বাড়াতে হবে এবং তার পরিপূরক হিসাবে মূলধনি বাজার থেকে ঋণের পথও খোলা রাখতে হবে।

(ক) নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ

পৌরসভাগুলির অর্থসংস্থানের পন্থাগুলি সম্বন্ধে যেকোনও আলোচনার প্রথমেই পৌরসভাগুলি নিজস্বভাবে যে অর্থের সংস্থান করে সেটা ভালো করে বুঝে নিতে হবে। কারণ একেবারে বুনিয়াদি স্তরে পৌরসভাগুলির নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ আসলে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রশাসনের মান, স্বচ্ছতা, তথা প্রশাসনের দায়বদ্ধতারই প্রতিফলন ঘটায়। একটি পৌরসভার নিজস্ব অর্থসংস্থানের দক্ষতা আসলে তার প্রশাসনের মানেরই পরিচায়ক। একটি সুপরিচালিত পৌরসভায় অনেক বেশি তথ্য পাওয়া যাবে, মূল্যায়নের উন্নততর ব্যবস্থাপনা থাকবে এবং কর বা মূল্য সংগ্রহের ব্যবস্থাও অনেক দক্ষ হবে। আর এরই প্রতিফলন ঘটবে নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণে। দ্বাদশ অর্থ কমিশনের তথ্যানুযায়ী ২০০১-০২ সালে ভারতের পৌরসভাগুলির মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র মাত্র ০.৬৭ শতাংশ। তার মধ্যে পৌরসভাগুলির নিজস্ব রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৩৮ শতাংশ। মান নির্ণয়ের বিচারে এই সংখ্যা যে যৎকিঞ্চিৎ শুধু তাই নয়, বরং ব্রাজিলের মতো উদীয়মান অর্থনীতিগুলির অবস্থাও এর তুলনায় অনেক ভালো। যেমন, ব্রাজিলে পৌরসভাগুলির মোট রাজস্বের পরিমাণ জিডিপি-র ৭.৪ শতাংশ এবং নিজস্ব রাজস্ব জিডিপি-র ২.৬ শতাংশ। এছাড়া ভারতে চিন্তাজনকভাবে শহরের মোট রাজস্বের তুলনায় পৌরসভাগুলির নিজস্ব রাজস্বের অনুপাত ২০০২-০৩ সালের ৬৩.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০০৭-০৮ সালে হয়েছে ৫২.৯ শতাংশ।

সম্পত্তি কর

পৌরসভাগুলির নিজস্ব রাজস্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল সম্পত্তি কর। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের হিসাব অনুযায়ী আদায় করা সম্পত্তি করের পরিমাণ জিডিপি-র ০.১৬ শতাংশ থেকে ০.২৪ শতাংশের মধ্যে। অর্থ কমিশনের মত অনুযায়ী এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সম্পত্তির মূল্য নিরূপণের বেহাল দশা ৫৬ শতাংশ, কর আদায়ে দক্ষতার অভাব ৩৭ শতাংশ দায়ী। আর সবার ওপরে রয়েছে সম্পত্তির মূল্য নিরূপণের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি।

একটি উন্নত সম্পত্তি কর ব্যবস্থার পাঁচটি স্তম্ভ থাকে যথা—চিহ্নিতকরণ, তালিকা পরিচালনা, মূল্য নিরূপণ, কর আদায় এবং বলবৎকরণ ব্যবস্থাপনা। একটি শহরে সমস্ত সম্পত্তির মানচিত্র তৈরি করার কাজে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) প্রয়োগ করা গেলে সম্পত্তির মূল্য নিরূপণের কাজে চমকপ্রদ সাফল্য পাওয়া যাবে। কারণ এতে পৌর প্রশাসন করের আওতার বাইরে থাকা কোনও সম্পত্তির দৃশ্যের পাশাপাশি পরিসরের যে ছবিটা পাবেন তাতে অনায়াসে সেটিকে সঠিক স্থান চিহ্নিত করে নিতে পারবেন। এদেশে শহরগুলিতে জিআইএস প্রয়োগের কাজ এখনও ধীর গতিতে চলছে। তবে আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদের মতো শহরগুলিতে সম্পত্তি কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে জিআইএস মানচিত্র কাজে লাগানো হচ্ছে। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের হিসাবে এও দেখানো হয়েছে যে যদি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সম্পত্তি করের মূল্য নিরূপণ হয় এবং কর আদায়ের দক্ষতা দুটোই ৮৫ শতাংশে পৌঁছে যায় তাহলে সম্পত্তি করের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় জিডিপি-র ০.৬৮ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে যা বর্তমানের তুলনায় তিন থেকে চারগুণ বেশি।

মূল্য নিরূপণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে বলা যায় যে সাম্প্রতিককালে জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর নবীকরণ মিশন (জেএনএনইউআরএম) চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতি সংশোধনের কাজে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে এবং তার পাশাপাশি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনে সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেইমতো কয়েকটি রাজ্য তাদের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করেছে এবং সেইসঙ্গে সম্পত্তি করের ব্যবস্থাপনাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে একটি আধা বাজার ও এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। এই নতুন ব্যবস্থায় পুরোনো আমলের খাজনার মূল্যের ভিত্তিতে নয়, বরং অবস্থান ও ব্যবহারের ধরন দেখে সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করা হবে। দেশের সমস্ত শহর যাতে এই ধরনের এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থা এবং শেষপর্যন্ত 'ক্যাপিটাল ভ্যালুভিত্তিক' মূল্য নিরূপণ ব্যবস্থা

(অর্থাৎ সম্পত্তির ব্যবহার, নির্মাণ, ধরন ও সম্পত্তি কত পুরোনো তার ভিত্তিতে মূল্য নিরূপণের ব্যবস্থা) গ্রহণে এগিয়ে আসে সে ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন যাতে নতুন মূল্য নিরূপণ ব্যবস্থায় জমির মূল্যের বৃদ্ধির যথাযথ প্রতিফলন ঘটে। এই ব্যবস্থা চালু করা গেলে সম্পত্তি করও রাজস্বের একটা কার্যকর উৎস হয়ে উঠবে। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ওইসিডি (অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) দেশগুলিতে সম্পত্তি করের পরিমাণ জিডিপি-র প্রায় ২ শতাংশ; অন্যদিকে উন্নয়নশীল অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি থেকে বাজার অর্থনীতির পথে যাত্রা শুরু করা দেশগুলিতেও (ট্রানজিশনাল ইকোনমি) এই সম্পত্তি করের পরিমাণ জিডিপি-র ০.৬৫ শতাংশ। অথচ ভারতে সম্পত্তি করের পরিমাণ জিডিপি-র মাত্র ০.২০ শতাংশ। ভারতকেও ওই সমস্ত দেশের মাপকাঠি অনুযায়ী এগোতে হবে। সম্পত্তি করের পরিমাণ যদি জিডিপি-র ০.৫০ শতাংশেও নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে প্রকৃত অঙ্কে ২০,০০০ কোটি টাকা আদায় হবে, যা বর্তমানের ৮,০০০ কোটি টাকার তুলনায় যথেষ্ট বেশি। আর ওইসিডি দেশগুলির অনুপাতে সম্পত্তি কর আদায় হলে এই কর বাবদ আয়ের অঙ্কটা ১ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে যেতে পারে।

এদেশের সম্পত্তি কর ব্যবস্থার আরেক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এখানে এই করের হার রাজ্য সরকারই বহুলাংশে স্থির করে দেয়। শহরগুলির এখানে ভূমিকা থাকে না। এই ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সঙ্গে একেবারেই বেমানান এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমে পৌরসভাগুলির অর্থসংস্থানের প্রধান উপায়টিই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তি কর না থাকা মানে পৌরসভাগুলি ঢাল ও তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার। একদিকে পৌরসভাগুলির কাঁধে বিপুল দায়িত্বের বোঝা। অথচ সেই দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থসংস্থানের কোনও কার্যকর উৎস নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমগোত্রীয় উন্নয়নশীল দেশ যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার আদলে সম্পত্তি কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো বাঞ্ছনীয়। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকায় সমস্ত পৌরসভায় 'ক্যাপিটাল ভ্যালুভিত্তিক' সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সমস্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণেরও বিধান দেওয়া হয়েছে। শহরগুলিই যাতে সম্পত্তি করের হার নির্ধারণ এবং আদায়ের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা নিশ্চিত করেছে কেন্দ্রীয় স্তরে প্রণীত এই আইন, কিন্তু করের হারে যাতে কোনও বৈষম্য না আসে তা ঠেকাতে অবশ্য যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে মূল্য আদায়

জল সরবরাহ, নিকাশি এবং বর্জ্য অপসারণের মতো সরকারি পরিষেবার জন্য ব্যবহারকারী বা গ্রাহকদের কাছ থেকে মূল্য আদায় পৌরসভাগুলির আয়ের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। এই পরিষেবাগুলির একটা 'বেসরকারি' চরিত্র আছে। কারণ গৃহস্থালির স্তরে এই পরিষেবাগুলির সুবিধাকে অবশ্যই 'বেসরকারি' বলা যেতে পারে। যেহেতু 'অতিরিক্ত' আরও কোনও সরকারি পরিষেবা চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাই এই সমস্ত পরিষেবার জন্য গ্রাহক বা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে মূল্য আদায় করা যেতেই পারে। কিন্তু এদেশে গ্রাহক মূল্য বাবদ আদায় করা রাজস্বের পরিমাণ ভীষণভাবেই কম। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে শহরের সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির (ইউএসবি বা পৌরসভা) কর-বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ জিডিপি-র মাত্র ০.১৮ শতাংশ। গ্রাহক মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা না থাকলে শহরগুলিতে মৌলিক ন্যূনতম পরিষেবাগুলিও দেওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

দীর্ঘমেয়াদিভাবে ন্যূনতম মানের মৌলিক পরিষেবা বজায় রাখতে গেলে গ্রাহকদের কাছ থেকে মূল্য আদায় খুব জরুরি যাতে তা দিয়ে চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চলতি ব্যয় নির্বাহ করা যায়। জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর নবীকরণ মিশনে (জেএনএনইউআরএম) এ বিষয়টির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হলেও ১০টিরও কম শহরে জল সরবরাহ ও নিকাশি পরিষেবার ব্যয় গ্রাহক মূল্য দিয়ে মেটানো গেছে; এছাড়া পাঁচটিরও কম শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিষেবার ব্যয় গ্রাহক মূল্যের মাধ্যমে পুরোপুরি নির্বাহ করা গেছে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে গ্রাহক মূল্য বসানোর জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শহরগুলিকে রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিতে হয়। এতে শহরগুলি যথাযথ মনে করলেও নিজেদের ইচ্ছেমতো গ্রাহক মূল্য স্থির করতে পারে না। তাই উন্নত পরিষেবা প্রদানের স্বার্থে সম্পত্তি করের মতো গ্রাহক মূল্য বসানোর ক্ষমতাও শহরগুলির হাতেই থাকা উচিত। পরিষেবা প্রদানের খরচ আদায়ের জন্য নিয়মিত গ্রাহক মূল্যের পর্যালোচনা প্রয়োজন। তবে গ্রাহক মূল্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষেবাও যাতে আরও উন্নত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। পরিষেবা উন্নত হলে মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি অনেক সহজে গ্রহণযোগ্য হবে। ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, নির্ভরযোগ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবার জন্য গাঁটের কড়ি খরচ করতে পরিবারগুলি সবসময়ই রাজি। এই কথা মাথায় রেখেই শহরগুলিকে উপযুক্ত গ্রাহক মূল্য ধার্য করতে হবে এবং পালটা ভরতুকি বা ক্রস সাবসিডি অর্থাৎ একটি পরিষেবার লাভের অর্থে অন্য পরিষেবার লোকসান পূরণের পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে সামগ্রিকভাবে চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ উঠে আসে। এমনকী যদি ন্যায্যতার প্রশ্ন বিবেচনা করে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন হারে মূল্য ধার্য করতে হয় তাহলেও যেন গ্রাহক মূল্যের মাধ্যমে চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ উদ্ধারের বিষয়টি অবহেলিত না হয়।

সম্পত্তি কর এবং গ্রাহক মূল্যের মাধ্যমে শহরগুলি যদি আরও বেশি পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করতে না পারে তা হলে দেশে উন্নত মানের জনপরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য কীভাবে পূরণ হবে সে নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। এদেশের শহরগুলির যদি ব্রাজিলের মতো সমগোত্রীয় দেশগুলির বেঁধে দেওয়া মাপকাঠি অনুযায়ী নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারত তাহলে শহরগুলির নিজস্ব রাজস্বের পরিমাণ এখনকার চাইতে সাতগুণ বেশি হত। নিজস্ব রাজস্বের ভিত্তি এভাবে বাড়লে নিজস্ব রাজস্ব এবং হস্তান্তরিত রাজস্বের পরিমাণের অনুপাতেরও একটা

মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে; তা বর্তমানের ১ : ৩ অনুপাত থেকে ১ : ৯ কিংবা ১ : ১০-এ পৌঁছে যেতে পারে। এইভাবেই এদেশের শহরগুলির সামনে নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহের অনেক নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

(খ) বাজার থেকে অর্থ সংস্থান

একটি শহরে নিজস্ব রাজস্বের সূত্রগুলি ঠিকমতো কাজ করলে, মূলধনি ঋণের বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের একটা বিকল্প পথও খুলে যায়। সম্পত্তি কর বা গ্রাহক মূল্যের মতো নিজস্ব রাজস্বের উৎসগুলিই কিন্তু যেকোনও পৌরসভার কাছে অর্থ সংস্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কারণ নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকরী নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহের উপায় না থাকলে বাইরের নতুন কোনও উৎস থেকে অর্থসংগ্রহ করা ভীষণ কঠিন। বাইরের বিভিন্ন উৎস তা সে ব্যাংক ঋণ, বন্ড বা মূলধনি বাজারের অন্যান্য প্রকরণ হোক না কেন এগুলির সুবিধা পৌরসভাগুলি শুধুমাত্র বর্তমানে কী পরিমাণে নিজস্ব রাজস্ব আয় করছে কিংবা ভবিষ্যতে কত আয় করতে পারে তার ভিত্তিতেই নিতে পারবে। তার কারণ, ঋণ নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্তে অর্থ সংস্থানের একটা উৎস মাত্র। ভবিষ্যতে পৌরসভাগুলির নিয়মিত রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনা কতটা এবং তা দিয়ে নিয়মিত অর্থ পরিশোধ সম্ভাবনাই বা কতদূর এসব প্রশ্ন বিচার করেই ঋণ মঞ্জুর করা হয়। তাই ঋণকে অতিরিক্ত আয়ের উৎস বলে ধরাটা মোটেই উচিত হবে না। তবে ঋণের মেয়াদের সময়ের হেরফের করা যায়, স্বল্পমেয়াদি ঋণকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণে পরিণত করা যায়। সেক্ষেত্রে শহরগুলি বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে পারে। কোনও পৌরসভা বাইরের সূত্র থেকে তখনই ঋণ পেতে পারে যখন সেই পৌরসভা দেখাতে পারবে যে নিরবচ্ছিন্ন এবং স্থিতিশীল আয়ের উৎস তার রয়েছে। তাই বাইরের সূত্র থেকে বাণিজ্যিক ঋণের সুবিধা নেওয়ার জন্য পৌরসভার অর্থসংস্থানের নিজস্ব উৎসগুলোকে যথাযথ থাকতে হবে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার যদি একটি শহরের চাহিদা অনুযায়ী সহজ শর্তে ঋণের গ্যারান্টি দেয় তাহলে শহরের পক্ষে সেটা অবশ্যই মূলধনি বাজার থেকে ঋণ নেওয়ার চেয়ে ভালো বিকল্প হবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আর্থিক বোঝা এবং শহরগুলির বিপুল অর্থের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের দিনে মূলধনি বাজার থেকে ঋণ নেওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

মিউনিসিপাল বন্ড

এদেশে মিউনিসিপাল বন্ডের ধারণাটা নতুন। ১৯৯৮ সালে আহমেদাবাদ পৌর নিগম তাদের জল সরবরাহ পরিকাঠামোর জন্য অর্থ জোগাড় করতে যে বন্ড ছেড়েছিল তার মাধ্যমেই এদেশে মিউনিসিপাল বন্ড বাজারের সূচনা। পরবর্তীকালে হায়দরাবাদ, চেন্নাই, নাগপুর, ইন্দোর, মাদুরাই, লুধিয়ানা, বিশাখাপত্তনম এবং অন্য কয়েকটি পৌরসভাও এই ধরনের বন্ড বাজারে এনেছে। ২০০০ সালে করমুক্ত মিউনিসিপাল বন্ডের ধারণা চালু হওয়ার পরে একগুচ্ছ করমুক্ত বন্ড বাজারে ছাড়া হয়। ৯০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের করমুক্ত মিউনিসিপাল বন্ড বাজারে ছাড়া হয়। এর পর অঙ্কের বিচারে মিউনিসিপাল বন্ডের বাজার আরও অনেক বাড়বে বলে যে আশা করা হয়েছিল তা পূরণ হয়নি। আর তার একটি অন্যতম কারণ জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর নবীকরণ মিশন (জেএনএনইউআরএম)। জেএনএনইউআরএম-এর আওতায় বিনিয়োগের জন্য মোট অনুমোদিত ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৫৩ শতাংশ কেন্দ্রীয় সহায়তার আকারে আসে। এই সহায়তা নিঃসন্দেহে শহরের পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে কিন্তু একইসঙ্গে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহে শহরগুলিকে নিরুৎসাহিত করেছে। সরকারি সহায়তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাণিজ্যিক অর্থসংস্থানের ক্ষেত্র সংকুচিত (ক্রাউডিং অডিট) হয়ে পড়বে কি না এ নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ দেখা গেছে জেএনএনইউআরএম-এর সূচনার পর বাজারে অনেক কম মিউনিসিপাল বন্ড এসেছে। জেএনএনইউআরএম বা সদ্য প্রস্তাবিত ১০০টি স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় সরকার যে অনুদান দেবে তার পরিপূরক হিসাবে মূলধনি বাজার থেকে ঋণ নিলে সীমিত সরকারি সহায় সম্পদকে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রকল্পে বণ্টন করা যাবে। শুধুমাত্র অনুদানের অর্থে হয়তো এই প্রত্যেকটি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

মিউনিসিপাল বন্ডের বাজার অনেক দিন থেকেই বেশ কার্যকরী। এখানে বেশকিছু অভিনব ব্যবস্থা রয়েছে যেমন 'পুল্‌ড বন্ড' ব্যবস্থাপনা যা ছোট ও মাঝারি শহরগুলির পক্ষে বেশ উপযোগী। যেসমস্ত ছোট বা মাঝারি শহরের মূলধনি বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের মতো ঋণগ্রহণযোগ্যতা (ক্রেডিটওয়ার্দিনেস) বা অভিজ্ঞতা নেই তারা এই ব্যবস্থার সুবিধা নিতে পারে। 'পুল্‌ড ফিনান্সিং' ব্যবস্থায় এই ধরনের শহরগুলি হাত মিলিয়ে এক ছাতার তলায় এসে একসঙ্গে ঋণ নিতে পারে। এতে তারা আয়তনজনিত গড় ব্যয় সংক্ষেপ বা ইকোনমিজ অফ স্কেলের সুবিধাও যেমন পাবে তেমনই তাদের ঋণগ্রহণযোগ্যতাও বাড়বে। এতে তারা একার উদ্যোগে যে সুদে বাজার থেকে ঋণ পেত তার চেয়ে কম সুদেই মূলধনি বাজার থেকে ঋণ পাবে। তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের মতো রাজ্যে 'পুল্‌ড ফিনান্সিং' ধারণার ওপর ভিত্তি করে সাফল্যের সঙ্গে বাজারে বন্ড ছাড়া হয়েছে। এই 'পুল্‌ড ফিনান্সিং'-এর প্রচলন ছোট শহরগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি, তাদের বিভিন্ন কাজের প্রক্রিয়ার মানোন্নয়নের পাশাপাশি শহরগুলিকে আরও মজবুত হয়ে উঠতে ও সেগুলির ঋণগ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। 'পুল্‌ড ফিনান্স' সংক্রান্ত বিষয়ের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনেক রাজ্যেই 'স্টেট পুল্‌ড ফিনান্সিং এনটিটি' (এসপিএফই) গঠন করা হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ এসপিএফই এখনও চালুই হয়নি। তবে এই বাজার যেন সক্রিয় থাকে তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে যে ছোট পৌরসভাগুলি যেন মূলধনি ঋণের বাজার থেকে ঋণের সুবিধা নিতে পারে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার পরিকাঠামো যা এখনও পর্যন্ত এদেশে নেই অথচ থাকলে ভালো হত সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। একটি বাজার সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান (মার্কেট মেকিং ইনস্টিটিউশন) যে প্রতিষ্ঠান পৌরসভাগুলিকে ঋণদানের ক্ষেত্রে তার গ্যারান্টি দেবে এবং সংশ্লিষ্ট পৌরসভাগুলির ঋণগ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে। এই প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত কৌশলগুলি গ্রহণ করে মিউনিসিপাল বন্ডের বাজারের কর্মকাণ্ডকে আরও চাঙ্গা করে তুলতে পারে যেমন—

(i) পৌরসভাগুলিকে ঋণদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে উৎসাহিত করে পৌরসভার ঋণের গ্যারান্টির ব্যবস্থা করতে পারে।

(ii) মিউনিসিপ্যাল বন্ডের অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের অংশে (ট্রাঞ্চেস) বিনিয়োগ করে মূলধনি কাঠামোর (দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, স্বল্পমেয়াদি ঋণ, সাধারণ ইক্যুইটি, প্রেফারড ইক্যুইটি ইত্যাদি নিয়েই হয় একটি সংস্থার মূলধনি কাঠামো, অধিক মূল্যের অংশে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ উৎসাহ দিতে পারে।

(iii) বিশেষ বিশেষ 'পুলড্ বন্ড' ছাড়ার ক্ষেত্রে দায় গ্রহণ করতে পারে, অর্থাৎ বিক্রি না হওয়া বন্ড কিনে নেওয়া দায় (আন্ডাররাইট) নিতে পারে।

(iv) কোনও সংস্থার কারবার গোটানোর সময় যে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি প্রাধান্য পায় না সেই 'সাবঅর্ডিনেট ডেট'-কে বিভিন্ন প্রকল্পে স্থানান্তরিত করে বন্ডের অর্থের সংস্থান করতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকার উদাহরণই ধরা যাক। সেদেশে ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ সাউথ আফ্রিকা এই ধরনের বাজার সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করে ঋণের গ্যারান্টি দিচ্ছে। ভারতে এইচইউডিসিও (হাডকো)-এর মতো প্রতিষ্ঠান নিজেদের কাজকর্মের অভিমুখ একটু বদলে এই ধরনের বাজার সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে। শুধুমাত্র বৃহৎ বিদ্যুৎ ও গ্যাস প্রকল্পে ভরতুকি মূল্যে ঋণদানের বদলে শহরের পরিকাঠামোয় অর্থ জোগানের মূল লক্ষ্যের আরও কাছাকাছি যদি হাডকো আসতে পারে তাহলে এই সংস্থা বাজার সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে। এইভাবে হাডকো, একদিকে যেমন বাজারের কাছে পৌরসভাগুলির প্রকৃত ঋণগ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরতে পারে এবং পৌরসভাগুলিকে তাদের প্রশাসন ও পরিষেবা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধানে উৎসাহিত করতে পারে; তেমনই অন্যদিকে ঋণগ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে এমন এমন পৌরসভার ঋণের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক লগ্নি টানতে পারে। আর একই সঙ্গে ঋণগ্রহণযোগ্যতার বিচারে নীচের সারিতে থাকা পৌরসভাগুলিকেও ঋণের বাজার থেকে ঋণের ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

পরিশেষে

দেশের শহরগুলিতে মৌলিক পরিকাঠামো ও পরিষেবা প্রদানের জন্য দীর্ঘমেয়াদিভাবে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা না করা গেলে দেশের মানুষ কখনও নগরায়ণ ও আর্থিক বিকাশের পূর্ণ সুফল উপভোগ করতে পারবে না। তাই দেশের শহরগুলিকে পরিষেবা প্রদানের ন্যূনতম মান বজায় রাখার জন্য নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি বাজার থেকে অর্থসংস্থানের সুবিধাও পুরোদমে নিতে হবে।❑

[লেখক আনন্দ সহস্রনমন আইএফএমআর ফিনান্স ফাউণ্ডেশনের কার্যনির্বাহী নির্দেশক।
বিষ্ণু প্রসাদ আইএফএমআর ফিনান্স ফাউণ্ডেশনে কর্মরত]

সিভিল সার্ভিস অ্যাকাডেমি

হৃদয়পুর, বারাসাত, উঃ ২৪ পরগণা

যোগাযোগ ঃ 9434239679/9874950816

সুদীর্ঘ ২৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী বঙ্গীয় এই শিক্ষাদান কেন্দ্রটি প্রশাসক ও আধিকারিক তৈরীর কাজে সর্বাধিক সফল ও উৎকর্ষের শীর্ষে রয়েছে। বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী ও WBCS অফিসার দ্বারা পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান 350 জনেরও অধিক প্রশাসক তৈরী করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

প্রতি বছরের মতো এবছরেও প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন WBCS (Exe.) শ্রী সমীর রঞ্জন চট্টরাজ [M.A. (Double). B.Ed. Kavya Tirtha] অ্যাকাডেমি ভবনে সিভিল সার্ভিসের প্রতি আগ্রহী ও প্রতিশ্রুতিবান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 20th September ও 18th October বেলা 11টা থেকে Free Counselling এর আয়োজন করেছেন। আরও অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক ও উপস্থিত থাকবেন।

অংশগ্রহণ করতে হলে আজই Phone করে নাম নথিভুক্ত করুন। আসন সংখ্যা সীমিত।

অ্যাকাডেমির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ-

১) WBCS-এর পরিবর্তিত বিষয় বিন্যাসের ওপর গুরুত্ব দিয়ে Prelim ও Main (Optional সহ) এক সঙ্গে পড়ানো হয়।
২) বিষয়ভিত্তিক ও সর্বোৎকৃষ্ট মানের study material দেওয়া হয়।
৩) ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য ও মানসিক উৎকর্ষের জন্য PSC এর মান অনুযায়ী প্রতিমাসে একাধিক Mock Test-এর ব্যবস্থা করা হয়।
৪) ইংরেজি ও অঙ্ক বিষয় দুটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিশেষজ্ঞ দ্বারা Class করানো হয়।
৫) ডাকযোগে Study Materials দেওয়া হয়।

❖ এবছর Prelim দিয়ে এখনও পর্যন্ত যারা Main-এর পর্যাপ্ত Study Materials এর জন্য বিভ্রান্ত হচ্ছেন তারা সম্পূর্ণ material একসাথে সুন্দরভাবে পেতে পারেন আমাদের কাছে।

Free Counselling এ অংশগ্রহণ করতে, অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হতে বা
Study Material সংগ্রহ করতে ফোন করুন ঃ 9434239679/9874950816

2015-এ প্রস্তুতির জন্য ভর্তি শুরু হবে September, 2014 থেকে।

—মার্জনা চট্টরাজ (ডাইরেক্টর)

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

নগরায়ণ এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ

শহরের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন নতুন ধ্যানধারণা

শহরের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন এক কঠিন দায়িত্ব। বিশেষ করে এই দ্রুত নগরায়ণের যুগে একটা প্রশ্ন বারবার উঠে আসছে এদেশে নগরোন্নয়নের যে চিরাচরিত ধারণা চলে আসছে তাকে কীভাবে সময়োপযোগী করে তোলা যায়? যে সেকেলে উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোনও অপ্রথাগত ক্ষেত্রকে স্থান দেওয়া হয় না, বা বস্তি এলাকাকে বেআইনি বলে চিহ্নিত করা হয়, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সেই পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে যায়। আবার, পরিকল্পনায় জনস্বার্থে ব্যবহারের জন্য জমি সংরক্ষণ সত্ত্বেও যখন জমির মালিক, ডেভেলপার, সরকারি আধিকারিকের মধ্যে আঁতাঁত হয়ে যায় তখন সে নিয়েও থাকে প্রশ্ন। সেইসঙ্গে জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর নবীকরণ মিশনও (জেএনএনইউআরএম) যখন রাজ্যগুলির কাছে শুধু কেন্দ্রীয় সহায়তা পাওয়ার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় তখন নগরোন্নয়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ জাগে না কি? এই পরিস্থিতিতে নগর উন্নয়নের মডেল পরিকল্পনা কীভাবে তৈরি করা যেতে পারে? সেই পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় কারাই বা যুক্ত থাকবেন? বিস্তারিত আলোচনায় **ললিতা কামাথ।**

দেশ জুড়ে এখন চলছে নগরায়ণ প্রক্রিয়া। এই নগরায়ণ প্রক্রিয়ার পথে অনেক চ্যালেঞ্জও আসছে। একমাত্র আরও উন্নত এবং নতুন ধরনের নগর পরিকল্পনার মাধ্যমেই এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা সম্ভব। পরিকল্পনার মধ্যেই যে সমাধান লুকিয়ে রয়েছে তাকে পুঁজি করেই নতুন নতুন শহর নির্মাণ এবং বর্তমান শহরগুলির উন্নতিসাধন সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। নগর পরিকল্পনার সম্ভাব্য নতুন নতুন মডেলের বিভিন্ন দিক কী কী হতে পারে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। এই নিবন্ধের দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমত, নতুন শহর নির্মাণ ও বিদ্যমান শহরগুলির উন্নতি সাধনের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো। কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা যেমন যেমন যে নতুন শহরগুলি নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলিকে কি সত্যিই উন্নত পরিকল্পনা বিশিষ্ট শহর বলা চলে? বা আমাদের শহরগুলির ওপর চিরাচরিত নগর পরিকল্পনা উদ্যোগ সমূহ (যেমন কিনা উন্নয়ন পরিকল্পনা) এবং সেইসঙ্গে নতুন ধরনের উদ্যোগ সমূহ (যেমন নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা) কী জাতীয় প্রভাব ফেলেছে? কিংবা এই ধরনের আরও পরিকল্পনা হলে কি আরও নতুন নতুন বাসযোগ্য শহর গড়ে উঠবে? দ্বিতীয়ত, এই সমস্ত সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনার নতুন মডেলের সপক্ষে সওয়াল করাও এই নিবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। আর তার জন্য সবার আগে পরিকল্পনা বিষয়টা কী এবং ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে কীভাবে অনুশীলন করা হয় তা নতুন নতুন করে ভাবতে হবে। তাহলেই আদতে পরিকল্পনাগুলি কঠিন বাস্তবের উপযোগী হয়ে উঠবে এবং সেগুলি শহরে 'বসবাস' এবং 'কাজ' দুটোর পক্ষেই আরও উপযোগী ও কার্যকর পরিবেশ রচনা করতে পারবে।

ভারতে নতুন শহর গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা : একটি মিশ্র ছবি

কোনও অব্যবহৃত জমি যেখানে কোনও পুনর্নির্মাণ (রি মডেল) বা বিদ্যমান কাঠামো ভাঙার দরকার নেই সেখানে নির্মাণ হলে সাধারণভাবে 'গ্রিনফিল্ড' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।* স্বাধীনতার পর তিন দশকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির যুগে ১০০-রও বেশি গ্রিনফিল্ড শহর (যেমন জামশেদপুরের মতো বাণিজ্যিক শহর, চণ্ডীগড়ের মতো প্রশাসনিক শহর) গড়ে তোলা হয়েছে। তবে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা গড়ে শহরগুলির তুলনায় এই ধরনের শহরগুলির অবদান অনেক সীমিত। সমালোচকরা বলেন এই ধরনের পরিকল্পিত শহরগুলি দৈনন্দিন বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেছে বিশেষ করে, সমাজে দরিদ্র অংশের ক্ষেত্রে (যেমন কর্মস্থলের নিকটবর্তী স্থানে আবাসন গড়ে তোলার বিষয়ে) বা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত জটিল বিষয়গুলির মধ্যেও এই শহরগুলি সমন্বয় সাধন করতে পারেনি।

মুম্বই বা দিল্লির মতো মহানগরের পাশে নতুন পরিকল্পিত বসতি হিসাবে গড়ে ওটা দুটি স্থানও এক সময় চমক লাগিয়েছিল। আজ এগুলোকে তেমনভাবে পরিকল্পিত শহর বলে মনেই হয় না। কারণ এই সমস্ত স্থানে পরিকল্পনা ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে মানুষের দৈনন্দিন অভ্যেস। সিআইডিসিও, অর্থাৎ নভি মুম্বই এর পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অবৈধ নির্মাণ ও দখলদারি চলছে এবং শহরের বিকাশ দ্রুত ঘটা সত্ত্বেও মৌলিক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা সর্বত্র সমান নয়। অন্যদিকে গুরগাঁও-এর পরিকল্পনা ভীষণভাবেই বেসরকারি এবং বাজারকেন্দ্রিক। এখানে পরিবার ও ভবনগুলিকে বাজার থেকে অনাময়, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এমনকী পথ আলোকিত করার পরিষেবাও কিনতে হয়। বিনিয়োগ, শিল্প এবং নাগরিকদের আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক সফল এই গুরগাঁও মডেলেকে অবশ্য চড়া পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্য দিতে হচ্ছে। নভি মুম্বই বা গুরগাঁও—দুটি ক্ষেত্রেই বিকাশ প্রক্রিয়ার অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হল তেজি জমির বাজার। আর এই বাস্তবতার কথা মাথায় রেখে ওই এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনাকে (ডিপি) জমির বাজারের গতিবিধির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে

* ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশে একফালি জমিও প্রায় নেই যা কোনও না কোনও গোষ্ঠী ব্যবহার করে না বা তা দখল করে নেই। এটা দাবি করাটা সত্যের অপলাপ মাত্র। এই নিবন্ধে এই বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না।

হচ্ছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা আসলে বিশেষজ্ঞদের তৈরি একটি আদ্যোপান্ত সামগ্রিক পরিকল্পনা যেখানে ২০ বছর সময়কালের জন্য ভূমি ও সহায়সম্পদ বরাদ্দ স্থির করা হয়। কিন্তু এই দুটি শহরের ক্ষেত্রে এখনও নতুন করে পরিকল্পনা তৈরি হয়েই চলেছে। জমির মালিক, নির্মাণকারী (ডেভেলপার), স্থাপত্যবিদ্, ঠিকাদার এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থা সবাই এর মধ্যে জড়িয়ে; যে যার সুবিধা মতো পরিকল্পনায় অদলবদল ঘটিয়ে চলেছে (শেট্টি এটল ২০১২)। যেহেতু জমির দাম নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে তাই এর থেকে যে সমস্ত গোষ্ঠী মুনাফা করতে চায় তাদের কাছে বড় হাতিয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনা। কারণ এই পরিকল্পনার মাধ্যমে জমির ভবিষ্যৎ বা জমির ব্যবহারের সম্ভাবনা নির্ধারিত হয়।

তাই সুশৃঙ্খল উন্নয়নের লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা তা এখন স্থানীয় প্রভাব ও রাজনীতির চাপে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত হয়ে এক বিশৃঙ্খল কিন্তু এক কার্যকর বাস্তবতার জন্ম দিচ্ছে। এর ফলে যে প্রশ্নটা উঠে আসছে তা হল বিভিন্ন কারণ ও অংশীদারদের প্রভাবে গড়ে ওঠা জটিল শহর ব্যবস্থার জায়গা কি শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের তৈরি আদ্যোপান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা নিতে পারে?

শহরগুলির বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা কতটা প্রাসঙ্গিক

ব্রিটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারে পাওয়া উন্নয়ন পরিকল্পনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল শহরের বিকাশের পূর্বাভাস এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা। ব্রিটিশরা তাদের পরিকল্পনা রীতিতে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সময়োপযোগী সংশোধন আনলেও আমাদের পরিকল্পনা সংক্রান্ত আইনগুলিতে কোনও মৌলিক পরিবর্তন প্রায় নেই। এই কারণেই খাতায় কলমে উন্নয়নে পরিকল্পনা ও শহরের বাস্তব অবস্থার মধ্যে এত ফারাক।

সাধারণভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনার (ডিপি) আওতায় শহরের একটা সীমিত অংশই থাকে। যে অংশের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা সেই অংশই এই উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাভুক্ত। যেমন বস্তি এলাকাকে উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে ধরা হয় না। কারণ বস্তি এলাকাকে মনে করা হয় বেআইনি। আদতে যে সমস্ত ক্ষেত্রের ওপর অপ্রথাগত বা 'ইনফর্মাল' তকমা বসে গেছে সে সমস্ত কিছুই উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতা থেকে বাদ। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার এটা একটা মৌলিক ত্রুটি। কারণ এই এই অ-প্রথাগত ক্ষেত্রেই শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কর্মসংস্থান হয় এবং এই ক্ষেত্র শহরের জিডিপিতে যথেষ্ট অবদান রাখে। এই ক্ষেত্রের অবস্থান মোটেও শহরের কোনও উপান্তে নয়, এর উৎপাদনশীলতা বা এই ক্ষেত্রের পরিষেবার চাহিদাও কোনও অংশে কম নয়, বরং শহরের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে এই অ-প্রথাগত ক্ষেত্রের অবস্থান এবং প্রথাগত অর্থনীতির সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ (মুখোপাধ্যায় ২০১১)। ভারতীয় শহরগুলির কর্মীদের এক তৃতীয়াংশ এমন সব স্থানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকেন যেগুলিকে সাধারণভাবে কর্মস্থল বলা চলে না—যেমন বাড়ি বা রাস্তা (এনএসএস প্রতিবেদন ৫১৯, ২০০৪-০৫); এবং কর্মীদের ৭৫ শতাংশ অ-প্রথাগত ক্ষেত্রে নিযুক্ত (এনএসএসও, ২০০৫) এই বিপুল সংখ্যক মানুষ যদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোনও স্থানই না পান তাহলে শহরের মধ্যে কী করে তারা জমি বা পরিষেবা পাবেন? একমাত্র নির্বাচনের সময় স্থানীয় পৌরসভা বা পুরপিতা/বিধায়ক/সাংসদ তহবিলের অর্থে উন্নীত পরিকাঠামোর সুযোগ তাঁরা পান। এই ধরনের শহর গঠনের প্রবণতাই আজ বাড়ছে, প্রতিদিনকার রাজনীতির সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ যোগ—পোশাকি ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে 'প্রবল নাগরিক সংস্কৃতি' (বেঞ্জামিন, ২০১০)। উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে এই 'প্রবল নাগরিক সংস্কৃতি'র কোনও সাযুজ্য নেই, বরং অমিলই বেশি যা শহরের বাস্তব পরিস্থিতিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার অপ্রাসঙ্গিকতাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

পরিকল্পনা আইনগুলির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে শুধুমাত্র চূড়ান্ত খসড়াটিকেই পরামর্শ ও আপত্তি জানানোর জন্য প্রকাশ করা হয়। ফলে পরিকল্পনা তৈরির সময় মতামত জানানোর কোনও সুযোগ না থাকায় দীর্ঘসময় ধরে, বহু কাঠখড় পুড়িয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর একে চ্যালেঞ্জ করে নাগরিক বা রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি লড়াইতে নামে। সুন্দরসনের (২০১৪) প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ব্যাঙ্গালোর মাস্টার প্ল্যানে (২০০৫-১৫) তাদের আশপাশের এলাকার জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত পরিকল্পনা, জমি ব্যবহারের ক্ষেত্র বিন্যাস বিধি, যান-চলাচলের পরিকল্পনার যৌক্তিকভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কর্ণাটক হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিল নাগরিকদের একটি গোষ্ঠী। ২০১২ সালে এই পরিকল্পনায় (মাস্টার প্ল্যান) প্রস্তাবিত জমির মিশ্র ব্যবহার বিধি আদালত নাকচ করে দেয়। এইভাবেই পরিকল্পনাকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ব্যাঙ্গালোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া জমা পড়ার সময় থেকে দু'বছর পর চূড়ান্ত অনুমোদন মেলায় মধ্যবর্তী সময়ে পরিকল্পনা এই ধরনের অসংখ্য পরিবর্তন করতে হয়েছে। অন্যদিকে পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্বে থাকা পুরনিগমগুলি উপযুক্ত নির্মাণ বিধি প্রণয়ন না করেই নতুন পরিকল্পনায় তাদের হাতে যে আরও বেশি নির্মাণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। অথচ নির্মাণের ওপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ থাকলে এই নতুন নির্মাণ অনেক সুশৃঙ্খল হত (মোহন ও রাজাগোপাল, ২০১০)। এর ফলে যত্রতত্র নির্মাণ ও ঘিঞ্জি এলাকা বাড়ছে, পরিকাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন পরিকল্পনায় যে সমস্যাগুলি সমাধানের কথা ভাবা হয়েছিল তার কোনওটারই সুরাহা হল না।

বাস্তবের সঙ্গে পরিকল্পনাকে প্রসাঙ্গিক করে তোলার জন্য জনসাধারণের তরফে এই পরিমার্জিত পরিকল্পনার প্রচেষ্টা। এই উদাহরণ যে শুধু এই ক্ষেত্রেই মিলবে তা নয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরে এলিটরাই এই প্রচেষ্টাকে রূপ দেন এবং তারা এর যা সুবিধা পান তা পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যর্থতা অথবা বিনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিকল্পনা

এদেশের শহরগুলির জীবনযাত্রার শোচনীয় মানের জন্য যে হতাশা তার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী কিন্তু পরিকল্পনা লঙ্ঘনের ঘটনা। বস্তিগুলিতে যে দরিদ্র শহরবাসীরা ভিড় করেন তাঁদের সব সময় বেআইনি দখলদার বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু একমাত্র তাঁরাই যে বেআইনি কাজকর্মের সুবিধা নিচ্ছেন তা কিন্তু নয়। বিশ্বজুড়ে এই অ-প্রথাগত নগরায়ণ থেকে বস্তিবাসীদের তুলনাতেও মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নগরবাসী এবং উপনগরবাসীরা বেশি সুবিধা নিচ্ছেন।

বিশেষত, শহরের প্রান্তে বা উপকণ্ঠে যেখানে অ-প্রথাগতভাবে জমির প্লটিং বা জমি বিক্রি চলছে সেখানে তাঁরা বেশি করে এই সুবিধাটা নিচ্ছেন (রায়, ২০০৯)। তাই অ-প্রথাগত বিষয়গুলিকে দারিদ্রের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ভারতের শহরগুলিকে নিয়ে যেসব গবেষক লেখালেখি করছেন (চণ্ডীগড়ের বিষয়ে সারিন, দিল্লির বিষয়ে কাভিস্কর, ব্যাঙ্গালোরের বিষয়ে বেঞ্জামিন এবং নায়ার) তাঁরা সকলেই একটা বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছেন যে বস্তি গজিয়ে ওঠা বা শহরে বস্তি এলাকার বিস্তার কিংবা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির বে-আইনির কাজকর্মকে 'পরিকল্পনার ব্যর্থতা' হিসাবে দেখলে চলবে না বরং একে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার আবশ্যক অঙ্গ হিসাবেই দেখতে হবে। রায় (২০০৯) বলেছেন যে বিকাশের পূর্বাভাস দেওয়া ও বিকাশ প্রক্রিয়া পরিকল্পনার বদলে ভারতে নগর পরিকল্পনার অর্থ এখন ক্রম পরিবর্তনশীল অ-প্রথাগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূ-সম্পদের পরিচালনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে ভারতে পরিকল্পনা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল বিনিয়ন্ত্রণ (রায়, ২০০৯)। বিনিয়ন্ত্রণের অর্থ কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীনতা নয়। বিনিয়ন্ত্রণ হল এক ধরনের 'পরিকল্পিত অ-প্রথাগত ব্যবস্থা' যেখানে রাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নেয় এবং এই বৈপরীত্যের আবহেই নগর উন্নয়নের এক ধরনের প্রক্রিয়া জন্ম নেয়।

বিনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিকল্পনা ঠিক কীভাবে কার্যকরী হয় তা বোঝানোর জন্য কামাথ ও দীক্ষিত (২০১৪) মহারাষ্ট্রের শোলাপুর শহরের সংরক্ষণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এই শহরে ৯ লক্ষ মানুষের বাস। মহারাষ্ট্র শহর ও গ্রামাঞ্চল পরিকল্পনা আইনে যে সংরক্ষণের সংস্থান রয়েছে তার মাধ্যমে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে বিদ্যালয় ও বাগানের মতো জন পরিষেবার জন্য বিশেষ জমি সংরক্ষণ করতে পারে। পরিকল্পনায় জমি সংরক্ষিত থাকলে, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া যাবে না; আবার আগে থেকেই ভবন নির্মাণ হয়ে গেলে সেগুলিকে বিধিসম্মতও করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে পুরনিগম হাতে গোনা ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সংরক্ষিত জমি অধিগ্রহণ বা তার ওপর কোনও নির্মাণ করে থাকে (অবশ্যই অর্থাভাবের কারণ দেখিয়ে) রাজনীতিবিদরা ভোটে জেতার কৌশল হিসাবে জমি সংরক্ষিত রাখার জন্য চাপ দিয়ে থাকেন। সুশৃঙ্খল উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার বদলে রাজনৈতিক ফায়দার উদ্দেশ্যে এই যে সংরক্ষণ নীতির নমনীয় ব্যাখ্যা তা শেষ পর্যন্ত একবার সংরক্ষণ তার পরেই সুবিধা মতো সংরক্ষণ তুলে নেওয়া বা নাকচ করাটা এক বোঝাপড়ায় দাঁড়িয়েছে। এই ক্ষমতাই জমির বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর এইভাবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত জমির সিংহভাগেই অ-প্রথাগতভাবে বস্তি গড়ে উঠেছে এবং মাত্র ৬-৯ শতাংশ জমি পুরনিগম অধিগ্রহণ করতে পেরেছে। চাহিদার জোগান দিতেই কিন্তু এই অ-প্রথাগত উন্নয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যেমন বসতবাড়ির জন্য দরিদ্র মানুষের জমি চাই, আইনিভাবে যেটা সম্ভব নয় সেই সংরক্ষিত জমি থেকে জমির মালিক/নির্মাণকারীদের (ডেভেলপার) মুনাফা করা চাই, এই ধরনের অবৈধ কাজকর্মকে ইচ্ছা করে অগ্রাহ্য করে পরিকল্পনাকারী/সরকারি আধিকারিকদেরও লাভের অঙ্ক পকেটে পোরা চাই। এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে জমির হস্তান্তর নিয়ে স্থানীয় অংশীদারদের মধ্যে যে একটা মার্জিত বোঝাপড়া কাজ করছে তা স্পষ্ট এবং সেইসঙ্গে এও পরিষ্কার যে পরিকল্পনা নামক ব্যবস্থাপনাকে হাতিয়ার করেই নিজেদের মধ্যে এই বোঝাপড়াটা তাঁরা করছেন।

অ-প্রথাগত পরিকল্পনার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল আইনি ও বেআইনি কাজকর্মের সংজ্ঞা বদল। আজ যা বেআইনি বলে গণ্য হচ্ছে রাষ্ট্র তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাল তাকে বিধিসম্মত করে আইনি বলে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এর মাধ্যমে ধনীদের বেআইনি কাজকর্ম এবং দরিদ্রদের বেআইনি কাজকর্মের মধ্যেও একটা ফারাক তৈরি করা হয়। পরিকল্পনা লঙ্ঘন সত্ত্বেও যমুনাতীরে অক্ষরধাম মন্দিরকে বিধিসম্মত করে তোলা হয় অথচ পরিকল্পনা লঙ্ঘনেরই কারণ দেখিয়ে যমুনাতীরে বিরাট বস্তি এলাকা 'যমুনা পুস্ত'কে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়।

ভারতের পরিকল্পনা ব্যবস্থা থেকে যা বোঝা যাচ্ছে তা হল এই ধরনের গুচ্ছ গুচ্ছ পরিকল্পনা করে এদেশের শহরগুলির সমস্যা মেটানো যাবে না কারণ পরিকল্পনাগুলিই এই ধরনের শহর ও সেগুলি সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকল্পনা : বিশ্বমানের শহর গড়ে তোলার পদক্ষেপ?

সুশৃঙ্খল গঠনে উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিপি) তেমন কার্যকরী না হওয়ায় যে হতাশা তৈরি হয় তা থেকে পরিকল্পনার এক নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার এক প্রবণতা দেখা দেয়: কৌশলগত প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনা শহরগুলিকে বিকাশের প্রাণকেন্দ্র করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে বৃহৎ অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামো প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকল্পনা। বিশ্বমানের শহর গড়ে তোলার আশা নিয়েই এই ধরনের পরিকল্পনা। ২০০৬ সালে ৬৫টি বাছাই করা শহরকে নিয়ে চালু হওয়া জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর নবীকরণ মিশন (জেএনএনইউআরএম) এই জাতীয় উদ্যোগেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই মিশনের আওতায় পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিতে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি করতে এবং ২৩ রকমের প্রশাসনিক সংস্কার চালু করতে হয়। অর্থাভাবে বিপর্যস্ত, ওদিকে প্রয়োজনীয় লোকবল নেই; এই পরিস্থিতিতে শহরের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি (ইউএলবি) নগর বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি), নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা (সিডিপি), নগর অনাময় পরিকল্পনা (সিএসপি) এবং নগর মোবিলিটি পরিকল্পনা (সিএমপি) ইত্যাদি তৈরির দায়িত্ব বাইরের পরামর্শদাতাদের কাছে আউটসোর্স করে দিয়েছে। নগর উন্নয়ন পরিকল্পনাতে (সিডিপি) শহরের কোনও কৌশলগত এলাকাগুলিকে বিনিয়োগের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হবে তার একটি সামগ্রিক ছবি তুলে ধরার কথা; কিন্তু আদতে পরিকল্পনা তৈরির কাজে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থান (ইউএলবি) কর্মীরা যুক্ত না থাকায় এই পরিকল্পনা কিছু পৃথক পৃথক প্রকল্প পরিকল্পনায় সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কোনও আবেদন থাকছে না (হ্যাজার্ড সেন্টার, ২০০৮)। মিশনের আওতায় পরিকল্পনাগুলিকে সমান্তরাল পরিকল্পনা প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে যার সঙ্গে উন্নয়ন পরিকল্পনার (ডিপি) কোনও যোগ নেই এবং এর কোনও আইনি ভিত্তিও নেই। শহরের প্রয়োজন অনুযায়ী সামগ্রিক পরিকল্পনা নয়, বরং মিশন আওতায় পরিকল্পনাগুলি শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা পাওয়ার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই মিশনের অন্যতম লক্ষ্য শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের জন্য সুলভ আবাসন ও মৌলিক পরিষেবার বন্দোবস্ত। কিন্তু নাগরিকগোষ্ঠী ও গবেষকরা বলে থাকেন যে জেএনএনইউআরএম এই লক্ষ্য পূরণে মোটেও যত্নবান নয়। শুধুমাত্র দরিদ্রদের মৌলিক পরিষেবা প্রদানের প্রকল্পে যত অর্থ জোগানো হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি আর্থিক সহায়তা পেয়েছে ধনী সম্প্রদায়ের জন্য গৃহীত বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি (মহাদেবীয়া ২০১১)। অনেক শহরে পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির জন্য বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে, বাস্তুহারা করে তাঁদের শহরের একপ্রান্তে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। (সিটিজোন গ্রুপস ২০০৯; মহাদেবীয়া ২০১১) উন্নয়ন পরিকল্পনার (ডিপি) মতো নগর উন্নয়ন পরিকল্পনাতেও (সিডিপি) অ-প্রথাগত ক্ষেত্রের কোনও স্থান নেই।

সব মিলে পরিকাঠামো নির্মাণ ও শহরের প্রশাসন সংস্কারে এই মিশনের কাজ মোটেও আশাব্যঞ্জক নয় (কামাথ এবং জাকারিয়া ২০১৩)। সাক্ষ্য প্রমাণ অনুযায়ী এই মিশনের তত্ত্ব বলে সমস্ত শহরে পরিবর্তন আনার জন্য একই সূত্র প্রয়োগ করা। বিভিন্ন শহরের পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজন অনুযায়ী শহরের বিভিন্ন অংশের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা করা যায়নি। শহরের বিভিন্ন অংশীদারদের চাহিদার সঙ্গে এই মিশনকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আকারের ভিন্ন দক্ষতা বিশিষ্ট এবং আলাদা ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পন্ন শহরগুলির চালু প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বোঝার কোনও চেষ্টাই হয়নি। পক্ষান্তরে রাজ্যগুলি ও তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বুঝে কখনও এই মিশনকে প্রতিরোধ করেছে, কখনও নাশকতাও করছে, কখনও বা আপসের পথেও গেছে, কখনও আবার সুন্দরভাবে মেনেও নিয়েছে। রূপায়ণের ব্যর্থতা হিসাবে না দেখে এই ধরনের প্রতিক্রিয়াকে স্থানীয় ও রাজ্য স্তরের অংশীদারদের একধরনের রণকৌশল হিসাবেই দেখা ভালো ও যাদের এমন একটি মিশনের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে রূপ দিতে হচ্ছে যেখানে তাদের কোনও ভূমিকাই নেই। এমনকী তাদের বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলনও সেই পরিকল্পনায় নেই।

পরিশেষে

সমস্ত আলোচনার শেষে একটা কথা স্পষ্ট যে নতুন শহরের পরিকল্পনা, মহা পরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান) বা সাম্প্রতিক-কালের প্রকল্প ভিত্তিক পরিকল্পনাসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উন্নততর পরিকল্পনা বিশিষ্ট বা আরও বেশি বাসযোগ্য শহর গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের তৈরি এই পরিকল্পনাগুলির একটা অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হল খাতায় কলমে পরিকল্পনা এবং যাদের জন্য পরিকল্পনা তাদের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ফলে পরিকল্পনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে দরবার, সবশেষে পরিকল্পনায় পরিবর্তন। তাই এখন আমাদের ভাবতে হবে কীভাবে একটা নির্দিষ্ট আদর্শগত লক্ষ্যপূরণ করেও একটা সেকেলে পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে চলতি প্রশাসনিক কাঠামো ও বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির পক্ষে আরও উপযোগী করে তোলা যাবে?

প্রথমেই আমাদের বাস্তব রীতির দিকে লক্ষ রেখে পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণাটা বদলাতে হবে। পরিকল্পনা এই ধারণার মধ্যে প্রথম থেকেই প্রযুক্তিতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক মাত্রার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়ে যায়; এই দ্বন্দ্ব প্রথাগত আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি পরিবর্তনহীন পরিকল্পনানথি বনাম বিভিন্ন স্তরের আলাপ-আলোচনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বরাদ্দ নিয়ে সোজাসাপটা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অ-প্রথাগত উপায়ে তৈরি পরিকল্পনার দ্বন্দ্ব। বর্তমানে পর্যানুক্রমিক ঘটনার পর্যালোচনার পরিবর্তে প্রথাগত ও অ-প্রথাগত প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা যোগসূত্র রচনা করতে হবে। এর জন্য পরিকল্পনা রচনায় শুধু বিশেষজ্ঞদের নয়, বরং জনসাধারণকেও কেন্দ্রীয়ভাবে যুক্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীকরণ এবং রাজনীতিমুক্ত পরিকল্পনার যে ধারা চলে আসছে তার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আমাদের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীভূত করতে হবে। আলাপ-আলোচনার পরিসর বাড়াতে হবে। সেইসঙ্গে পরিকল্পনা ও স্থানীয় স্তরে জমি বণ্টন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ আরও জোরদার করতে হবে। ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের বিধান সত্ত্বেও বর্তমানে শহরের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থাগুলির (ইউএলবি) পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। আধা-সরকারি সংস্থাগুলি যেগুলিকে নিজেদের কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয় না। পরিকল্পনা তৈরিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আনুষ্ঠানিক কোনও ভূমিকাই থাকে না (কারণ সে ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে বিশেষজ্ঞদের); অথচ অ-প্রথাগত পরিকল্পনা প্রক্রিয়া, ছাড় সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা বা বিনিয়ন্ত্রণের নীতি জারির ক্ষেত্রে তাঁরাই প্রধান চালক। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তেমনভাবে প্রথাগত যোগাযোগ না থাকায় এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আবার ইউএলবি-গুলির মাধ্যমে শহরের সমস্যার স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক সমাধানের পথে না গিয়ে নিজেদের কাঁধে কোনও দায় না রেখে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ (যেমন স্থানীয় সমস্যা মেটানো বা ভাড়া আদায়) নিয়ে বেড়ান। পরিকল্পনা কোনও প্রযুক্তিতান্ত্রিক উদ্যোগ নয় বরং সমকালীন বিশ্বের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে শুরু করে আন্তঃরাজ্য স্তরেও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় রাজনীতিকে যুক্ত করতে হবে। সবশেষে, এটা মনে রাখতে হবে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিপি) তৈরি হওয়ার আগেই অধিকাংশ শহরের বিস্তার ঘটে গেছে। তাই একমাত্র এই পরিকল্পনা নথি দিয়েই শহরের বাস্তবতাকে বর্ণনা করা উচিত হবে না। উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনি ও বেআইনি কাজকর্মের মধ্যে ভেদাভেদ করা যাবে না। কারণ কোনটা আইনি আর কোনটাই বা বেআইনি তার ব্যাখ্যা পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করে কিছু বিশেষ গোষ্ঠী। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনাতে শহরের কার্যকারিতা, বা শহরকে আরও বেশি কাজের উপযোগী করে তোলার দিকেই বেশি লক্ষ দেওয়া উচিত। আর এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অ-প্রথাগত ক্ষেত্র যাতে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। এতে বহু মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে। প্রথাগত অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে। কারণ প্রথাগত অর্থনীতির সঙ্গে অ-প্রথাগত ক্ষেত্রের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।❑

[লেখক ললিতা কামাথ মুম্বইয়ের টাটা ইন্‌স্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেসের স্কুল অফ হ্যাবিট্যাট স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক।]

ভারতে নগরায়ণ ও কিছু ভাবনা

প্রতিটি দেশে, বিশেষ করে ভারতের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে শহরগুলি সংখ্যায় ও আয়তনে বাড়ছে। তার প্রধান কারণ মানুষ ক্রমশ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে কাজের আশায়, উন্নত জীবনমানের আশায়। যদিও তাদের সে আশা, সে ভরসা খুব শীঘ্রই মরীচিকার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে তবু তাদের এই পরিমাণ ঠেকানো যাচ্ছে না। কিছুটা এই কারণে এবং কিছুটা বেশ কিছু পুরানো শহর অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠার কারণে শহরের বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যে শহর আপাতদৃষ্টিতে ঝকঝকে, আধুনিক, চোখ-ধাঁধানো, তারও আড়ালে রয়েছে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জর্জর জীবনযাত্রার চিত্র। এই কি তবে আমাদের নগরজীবনের একমাত্র পরিণতি? লিখছেন **লক্ষ্মীনারায়ণ শীল**।

রাষ্ট্রসংঘের এক সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে যে ২০০৭ সালে বিশ্বের মানবজাতির অর্ধেকের বাস হল বিভিন্ন স্থানের শহর ও নগরগুলিতে। এই তথ্যানুযায়ী বর্তমান পৃথিবীর জনসংখ্যার ৬৬০ কোটি ২০৩০ সালে হবে প্রায় ৮২০ কোটি। এই জনসংখ্যার প্রতি দশজনে ছয়জন বাস করবে শহরাঞ্চলে। সমহারে বর্ধিত জনসংখ্যানুযায়ী ভারতের শহরাঞ্চলের বর্তমান জনসংখ্যা ৩০ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হবে প্রায় ৫০ কোটি। বিশ্বের বর্ধিত জনসংখ্যা মূলত কেন্দ্রীভূত হবে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার শহরগুলিতে। বর্ধিত এই জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ বাস করবে উন্নয়নশীল দেশসমূহের শহর এলাকাগুলিতে। এই বিশাল জনসংখ্যাকে পরিষেবা প্রদানের মতো উন্নত পরিকাঠামোও কোনও উন্নয়নশীল দেশে নেই। তাই বর্ধিত এই নাগরিকদের পরিষেবা প্রদান ও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চাহিদা পূরণ করাই হল একবিংশ শতাব্দীর নগর পরিকল্পনাকার ও নীতি নির্ধারকদের মূল চ্যালেঞ্জ।

ভারতে মোট ১২১ কোটি জনসংখ্যার (১ মার্চ, ২০১১) মধ্যে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ প্রায় ৩৮ কোটি। বিগত এক দশকে এই শহরবাসীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৯ কোটির বেশি। মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৩১.৬ শতাংশ শহরবাসী। বিগত ২০০১-২০১১ সালের মধ্যে শহরবাসী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩.৩৫ শতাংশ। বিগত এক দশকেই ভারতে নগরের সংখ্যা বেড়েছে ২৭৭৪টি। এর মধ্যে দশ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার শহর ৩৫টি (২০০১) থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৩টি (২০১১)। এর মধ্যে কেরালা রাজ্যেই দশ লক্ষাধিক মানুষের বসবাসকারী শহরের সংখ্যা মাত্র একটি—কোচি (২০০১) থেকে বেড়ে ৭টি হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং ছত্তিশগড়েও একটি করে দশ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার শহর গড়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য যে ২০০১ সালে

সারণি-১
ভারতে প্রধান প্রধান অঞ্চলে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার অনুপাত (শতাংশ)

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত	মোট জনসংখ্যায় শহরবাসী (শতাংশ)
দিল্লি	৯৭.৫
চণ্ডীগড়	৯৭.২৫
দমন ও দিউ	৭৫.২
পুদুচেরি	৬৮.৩
গোয়া	৬২.২
তামিলনাড়ু	৪৮.৪
কেরালা	৪৭.৭
মহারাষ্ট্র	৪৫.২
মিজোরাম	৫১.৫
সিকিম	২৫.০
ওড়িশা	১৬.৭
অসম	১৪.১
বিহার	১১.৩
হিমাচলপ্রদেশ	১০.০

সূত্র : কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রক

মোট প্রায় ১০৩ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ভারতে গ্রামীণ জনসংখ্যা ছিল ৭৪ কোটি ও শহরের জনসংখ্যা ২৯ কোটি (২৭.৮১ শতাংশ)। কিন্তু ২০১১-তে এই জনসংখ্যা বেড়ে গ্রামে হয়েছে ৮৩ কোটি ও শহরে ৩৮ কোটি (৩১.১৬ শতাংশ)। ভারতের প্রধান কয়েকটি রাজ্যের/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার অনুপাত সারণি-১ থেকে দেখা যাবে।

সারণি-১ থেকে বোঝা যায় দেশের প্রধান প্রধান অঞ্চলে/শহরে নগরায়ণের ফলে জনসংখ্যার চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। এমনকী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে মিজোরামেও শহরবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বেশি (৫১.৫ শতাংশ) হয়েছে। অবশ্য দেশের মোট শহরাঞ্চলীয় জনসংখ্যায় মিজোরাম-এর অংশ মাত্র ০.১ শতাংশ। সিকিমেও শহরবাসীর সংখ্যা ১১.০ শতাংশ থেকে এক দশকে বেড়ে হয়েছে ২৫ শতাংশ (২০১১)। অবশ্য দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রে শহরবাসীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটির বেশি—যা দেশের মোট শহরবাসীর ১৩.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। উত্তরপ্রদেশে শহরবাসীর জনসংখ্যা প্রায় ৪.৪০ কোটি ও তামিলনাড়ুতে ৩.৫০ কোটি।

বিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে নগরায়ণের বিকাশ ঘটছে, আর তা মূলত কেন্দ্রীভূত হয়েছে বিকাশশীল দেশগুলিতে। কারণ পশ্চিমের উন্নত

দেশগুলিতে নগরায়ণ এসেছে অনেক আগেই। এই নগরায়ণকে মানবসভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম সূচক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এই নগরগুলিই হল বিকাশের মূলক্ষেত্র, আর্থিক উন্নয়ন ও মানবসভ্যতার অগ্রগতির মূল পরিমাপক। বিশ্বায়নের এই শতাব্দীতে এই বিশাল সংখ্যক শহরবাসীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও উন্নত জীবনযাত্রার ঝোঁক বাড়ছে। নগরায়ণ পরিকাঠামো প্রস্তুত করতে প্রয়োজনও হচ্ছে বিশাল তহবিলের। ভারতের কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রক গঠিত হাই পাওয়ারড এক্সপার্ট কমিটির (High Powered Export Committee-HPEC) সুপারিশ অনুযায়ী (২০১১) দেশে নগর পরিকাঠামো নির্মাণে আগামী ২০ বছরে ৩৯.২ লক্ষ কোটি টাকা (২০০৯-২০১০ মূল্যস্তরের হিসাবে) বিনিয়োগ প্রয়োজন। এই অর্থের ৪৪ শতাংশ বিনিয়োগ করতে হবে শহরের বাকি রাস্তাঘাট নির্মাণে, বাকি ২০ শতাংশ প্রয়োজন জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ, রাস্তার বাতি প্রভৃতিতে, যানবাহনে ১৪ শতাংশ, বস্তি উন্নয়ন ইত্যাদিতে ১০.৫ শতাংশ ও নগর প্রশাসনের ব্যবস্থায় ২.৫ শতাংশ। শহরগুলিতে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি নিহিত রয়েছে সেকথা স্বীকার করা হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণে নগরায়ণের ভূমিকাও রয়েছে। এইসব চিন্তা করেই নগর উন্নয়ন মন্ত্রক ১৯৯৬-তে কেন্দ্রীয় সরকারের পথনির্দেশক (আরবান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানস্ ফরমুলেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন) সমস্ত রাজ্য সরকারের কাছে গ্রহণ করতে পাঠিয়েছেন। দেশের আর্থিক ঘাটতির অবস্থা বিবেচনা করে নগরায়ণের জন্য এই বিশাল বিনিয়োগের অর্থ সংস্থান যাতে বাণিজ্যিকভাবে করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে সংবিধানের ৭৪তম সংশোধন আইন ১৯৯২ পাশ করে স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে শহরাঞ্চলে পরিষেবা প্রদানের প্রস্তুতিও গৃহীত হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে শহরাঞ্চলীয় পরিকাঠামো ও পরিষেবা প্রদান এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প গঠনেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নগরায়ণ পরিকাঠামো গড়ে তোলার এই বিশাল ব্যয়ভার কোনও কেন্দ্রী বা রাজ্য সরকার বা কোনও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই বহন করা সম্ভব নয়। শহরাঞ্চলেই সরকারি আয় সবচেয়ে বেশি হয় এবং সেই অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তহবিলে সঞ্চিত হয়। তাই একাদশ পরিকল্পনাকালে শহরাঞ্চলের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্যে 'জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল, মিশন (JNNURM) সংগঠিত হয়েছে। (২০০৫-০৬)। সুস্থায়ী নগর উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের ৫০,০০০ কোটি টাকা ৭ বৎসরের জন্যে (২০০৫-০৬ থেকে) নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। মিশন শহর ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নেও এই সংগঠনের মধ্যে আর একটি 'আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্কিম ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম টাউনস' ২০০৫-০৬ সালেই সংগঠিত হয়েছে। এই মিশনের আওতায় শহরগুলির নগর সংস্কার ও নগর প্রশাসন সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যেও একটি 'পেয়ার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড রিফ্লেকটিভ লার্নিং' (PEARL=Peer Experience and Reflective Learning) প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।

নগরায়ণের জন্যে শুধু আর্থিক নয়— অনেক সমস্যারই সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শহরে উন্নত জীবনযাত্রার স্বাদ পেতে অনেক চাহিদাই সৃষ্টি হচ্ছে। শহরের জন্যে জমির চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে, অথচ সেই পরিমাণ জমির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই শহরের উপকণ্ঠে কৃষি জমিতে বসবাস গড়ে উঠছে। অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে চলছে নগরায়ণের কাছে। এতে সামাজিক ও পরিকাঠামোগত বৈষম্য বাড়ছে। একদিকে গড়ে উঠছে উন্নত জীবনযাত্রার পরিকাঠামো, অপরদিকে একটি বিশাল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের অনুন্নত জীবনযাত্রা। আবার মানুষের ন্যূনতম পরিষেবা প্রাপ্তির জন্যে সৃষ্ট হচ্ছে অসম প্রতিযোগিতা। তাই উন্নয়নশীল দেশের শহরগুলিতে দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের সংঘর্ষ, সামাজিক সমস্যা ও অসন্তোষ। আমেদাবাদ স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার-এর একটি সমীক্ষায় জানা যায় যে শুধুমাত্র কলকাতা মহানগরকে কেন্দ্র করে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে ১৩৫ বর্গকিমি এলাকা। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠার ফলে এখানে বেশি মানুষও বাস করতে অপারগ। পানীয় জল ও নিকাশি ব্যবস্থার মান সেখানে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব। বর্জ্য পদার্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে ঘটে চলেছে পরিবেশ দূষণ। এ সমস্যা একাধিক শহরের।

তাই সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আগামীদিনের চাহিদা চিন্তা করে নগরায়ণে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এজন্যে প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যূনতম ব্যবহার শহর ও গ্রাম এলাকার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও ভারসাম্য রক্ষা উন্নয়নকে সুস্থায়ী মাত্রা দেওয়ার লক্ষ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের বিভিন্ন দিকগুলিকে চিহ্নিত করে তার ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, উন্নত জীবনযাত্রা, পর্যাপ্ত পরিষেবাসমৃদ্ধ একটি সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উন্নয়ন কর্মসূচিতে গুরুত্ব দিতে হবে।

শহর পরিকল্পনাকার ও নীতি নির্ধারকদের পৌর পরিকাঠামো সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর ফলে সুসংহত যানবাহন ব্যবস্থা, পানীয় জলের সদ্ব্যবহার ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও শহর এলাকার ঐতিহাসিক স্থানসমূহের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হবে। সুসংহত নগর পরিকল্পনাটি যাতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে একটি পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রাখতে সক্ষম সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

নগরায়ণের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার মধ্যে নগরের আর্থিক ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার সমস্ত দিকগুলি বিকশিত করে তুলতে হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শহরাঞ্চলে বেকারদের অনুপাত গ্রামীণ এলাকার থেকে অনেক বেশি। মোট কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় বেকার সংখ্যার অনুপাত ১৯৭৭-৭৮ সালে ছিল ৭.৭ শতাংশ ও

শহর এলাকায় ১০.৩ শতাংশ। যদিও ২০০৯-১০ সালের হিসাবে এই বেকার সংখ্যার অনুপাত গ্রামীণ এলাকায় ৬.৮ শতাংশ ও শহরে ৫.৮ শতাংশে নেমে এসেছে তবুও দেখা যায় 'ক্যাজুয়াল' শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২২ কোটিতে। (ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন সার্ভেস) তাই শহর পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

কম খরচে বা কম বাজেটের প্রযুক্তি ব্যবহারে যাতে বাস্তুকার ও পরিকল্পনাবিদরা অগ্রাধিকার দিয়ে মনোনিবেশ করেন সে দিকটিতেও লক্ষ রাখতে হবে। কারণ বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণ ও প্রণয়নে মোট প্রয়োজনের প্রায় ৭০ ভাগই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে হবে। আর আর্থিক অভাব কাটিয়ে উঠতে তাই কম বাজেটের পরিকল্পনাই অধিক গ্রহণযোগ্য।

উন্নত দেশে গৃহীত নীতি বা ধারণা উন্নয়নশীল দেশে গ্রহণ করে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না। আমাদের নগরায়ণের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা কার্যকরী করতে দেশকেন্দ্রিক চিন্তার অবশ্যই প্রয়োজন। তাই পরিকল্পনাকার ও প্রযুক্তিবিদদের ধারণা ও অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক করে মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে। প্রতিবেশী চীনেও এই ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন ও নগরায়ণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই ভারসাম্যমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলি হল—শহর ও গ্রামীণ এলাকার মধ্যে ভারসাম্য, আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য, আর্থিক উন্নয়ন ও পরিবেশের সুস্থায়ী উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য, অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজারের ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য।

সারা বিশ্বে আর্থিক বৈষম্য ও বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার। নগরায়ণের ফলে এই বৈষম্য আরও বৃদ্ধি হবার অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই নগর পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনভিত্তিক আইন প্রণয়নেও জোর দিতে হবে। উল্লেখযোগ্য যে সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনী এদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তবে শুধু আইন প্রণয়নে কাজ হবে না। দরকার সদিচ্ছা ও বাস্তব ভাবনার।

ভারতের মাঝারি শহর ও মহানগরের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক উন্নত দেশের লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক প্রভৃতির জনঘনত্ব থেকেও বেশি। এইজন্যে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১২-১৭) গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—সুস্থিত উন্নয়ন, পরিবেশ ও নগর পরিকল্পনার ওপর। এই পরিকল্পনায় শক্তির দক্ষ ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের শক্তির সঞ্চিত ভাণ্ডার খুবই সীমিত। আবার পরিবেশে উষ্ণায়ন কমাতে ২০২০ সালের মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ২০-২৫ শতাংশ শক্তির, বিশেষ করে ফসিল জ্বালানির ব্যবহার কমাবার অঙ্গীকারও রক্ষা করতে হবে। এজন্যে দরকার আরও উন্নত প্রযুক্তির যানবাহন এবং যানবাহনে বায়ুদূষণ কমাতে ডিজেলের ব্যবহার হ্রাস করা। এজন্যে দেশে মোটরবিহীন যানবাহনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যায় যে মাত্র ৪ শতাংশ (মোট যানবাহনের মধ্যে) প্রাইভেট যানবাহন ২০ শতাংশ (যাত্রীবাহী যানবাহন) দূষণ ঘটায়। অপরদিকে মোটরবিহীন যানবাহনের মাত্র ৪ শতাংশ যাত্রীবহন করা হয়। এইসব সমস্যা চিন্তা করে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নগরায়ণে জনভিত্তিক ও জন অংশগ্রহণ এবং উন্নত গুণমানের নগর পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে জনসাধারণের জন্য নিরাপদ ও সহজসাধ্য যানবাহন পরিষেবা গঠনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার শেষে যাতে দেশে অন্তত ৫০ শতাংশ মোটর ব্যবহৃত ট্রিপ সরকারি যানবাহন দিতে সক্ষম হয় সেদিকে জোর দেওয়া হয়েছে। এতে মহিলা ও শিশুদের উপযোগী বিশেষ বাস, শৌচালয়ের ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান এবং বয়স্ক নাগরিকদের উপযোগী সহজ যানবাহন ব্যবস্থার প্রতি জোর দেওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্য পূরণে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শহরের রাস্তাঘাটের জন্যে বাজেটের ৭৫ শতাংশ, মেট্রোরেল ইত্যাদিতে ২০ শতাংশ এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রায় ২ শতাংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন ২ মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যার শহরে রেল প্রকল্প গঠনে পরিকল্পনা রচনায় এবং ৩ মিলিয়নের বেশি জনবসতির শহরে এই প্রকল্পে নির্মাণ শুরুর সুপারিশ করেছেন। ভারতের শহরগুলিতে মেট্রোরেল উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবানুযায়ী (২০১১) ২৬.১ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা যায় শহরের সামান্য সংখ্যক বাসিন্দাই মেট্রোরেলের ব্যবহার করতে পারে। বিদ্যুতের ব্যবহারে দূষণের মাত্রা এতে শহরে বাড়বে। এই বিনিয়োগে অর্থের সংস্থান করাও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়সাধ্য হবে। তাই সাধারণ যাত্রীদের স্বার্থে পাবলিক পরিবহণ ব্যবস্থাই সুবিধাজনক হবে।

রাস্তার যানবাহন পরিকল্পনা নগরায়ণে গতিসঞ্চার করতেই বেশি সক্ষম। অবশ্য তথ্যে প্রকাশ বিশ্বের মধ্যে ভারতে রাস্তায় দুর্ঘটনার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ১০,০০০ যানবাহনে মাত্র ২-এরও কম। অথচ ভারতে এতে মৃতের হার প্রায় ১০.৫ শতাংশ। ভারতে পথ দুর্ঘটনা ১৯৮১ সালে ১.৬০ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০০১ সালে ৩.৯০ লক্ষে পৌঁছেছে। যা চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি। ভারতে যদি হয় ১৩০ হাজার, চীনে তা ৭০ হাজার ও আমেরিকায় মাত্র ৩০ হাজার। এরমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ, যাদের বয়স সাধারণত ১৫ থেকে ৬৫ বৎসর ও কর্মক্ষম। এর মধ্যে পথচারী ৯ শতাংশ ও সাইকেলচালক ৫ শতাংশ। ট্রাক ও ট্যাক্সি, ভ্যান ইত্যাদির দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি—প্রায় ৩০ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান ২০১৩ সালের।

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাস্তা নির্মাণে বিনিয়োগ করা হয় ২.৭৯ লক্ষ কোটি টাকা। গাড়ির সংখ্যা ১৯৮০ সালের ৫ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০১১ সালে হয়েছে ১৪২ মিলিয়ন। ভারতে মার্চ ২০১০ সালে জাতীয় রাস্তা নিরাপত্তা নীতি গৃহীত হয়। অবশ্য প্রতিবেশী চীনে শুধু নীতি প্রণয়নে তারা থেমে থাকেনি। পথ দুর্ঘটনার মৃতের সংখ্যা ২০০৫-এর ১,০৭,০০০ থেকে

কমিয়ে ২০১১-তে ৬২,০০০-এ নেমেছে। তাই সদিচ্ছা ও সংগঠিতভাবে নীতি কার্যকরী করতে পারলে ভারতেও পথ দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হবে।

ভারতে ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের আর একটি বড় সমস্যা হল কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ভারতে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক তরুণ প্রজন্ম ও কর্মক্ষম। এইসব বিশাল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেই নগরায়ণের অগ্রগতি ঘটাতে হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে আমেদাবাদ শহরটি ভারতের নগরায়ণে অগ্রগণ্য হলেও অনেক দরিদ্র মানুষ এই শহরে কঠিন সমস্যায় জর্জরিত হয়েছেন। আহমেদাবাদ শহরের জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। এখানে একসময় ৬৪টি কাপড়ের কলে অনেক মানুষ জীবিকায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এইসব কারখানা একসময় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শহরের প্রায় ৮০ শতাংশ শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে পড়েন। এখন সেখানে আহমেদাবাদের প্রায় ৭৫-৮০ শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ, বিশেষ করে মহিলারাও রাস্তার উপর বসেই বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। পশ্চিম আহমেদাবাদে শহরের ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাস। এখানে রাস্তার ধারে হকারি বন্ধ হয়েছে যাতে যান চলাচলে অসুবিধা ও বায়ুদূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এজন্যে পরিকাঠামো পরিকল্পনা কার্যকরী করতে ২০০৬-০৮ সালের মধ্যে প্রায় ২৮,০০০ বস্তিবাসী উচ্ছেদ হন এবং প্রায় ২০০০ বাসিন্দা এলাকা ত্যাগের নোটিশ পান। আহমেদাবাদে সবরমতি রিভারফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট কার্যকরী করে শহরটিকে সবদিক দিয়ে উন্নত করে গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে অনেক মানুষই উচ্ছেদ হয়ে পানীয় জলের অভাব ও শৌচালয়ের সমস্যার মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হন। এইভাবে নগরায়ণের ফলে দরিদ্র মানুষ জীবন-জীবিকার সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েন।

এইভাবে চেন্নাইতে কান্নাগি নগর বস্তি এলাকার মানুষও নগরায়ণ প্রকল্পের বাস্তবায়নে দুর্বিষহ জীবন সমস্যায় জর্জরিত হয়েছেন। অবশ্য নগরায়ণের ফলে বস্তিবাসী ও দরিদ্র মানুষের জীবন যন্ত্রণা বিশ্বায়নের নীতি প্রয়োগের ফলে ক্রমশ গা-সওয়া হয়ে উঠছে। বিশ্বের অনেক দেশেই দরিদ্র সাধারণ মানুষ নগরায়ণের বলি হচ্ছেন এবং তাদের জীবন-জীবিকা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ('ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি' ডিসেম্বর ১, ২০১২)। সম্প্রতি বিশ্বকাপ শুরুর প্রাক্কালে ব্রাজিলেও সাধারণ দরিদ্র মানুষ জীবন যন্ত্রণায় বিক্ষোভ প্রকাশ করছেন। অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ও প্রশাসনিক অব্যবস্থার চাপে ক্রমশ গরিব হতে থাকা নাগরিকদের সুপরিকল্পিতভাবে শহর থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই দেশের ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন মানুষ শহরবাসী। গ্রামকে শহর করে দেওয়ার প্রবণতা এখানে জোরদার ছিল। এখন এর উলটো যাত্রা শুরু হয়েছে, বড় শহর থেকে উচ্ছেদ হয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট শহর এবং ছোট শহর থেকে উচ্ছেদ হয়ে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষকে। ('এই সময়' ৮ জুন ২০১৪ রবিবারোয়ারি পৃ ৩)। এইরকম অবাস্তব নগরায়ণ পরিকল্পনায় দরিদ্র মানুষেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি। তাই বিভিন্ন দেশের নগরায়ণে অগ্রগতির অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করেই আমাদের নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করতে হবে—যাতে দরিদ্র মানুষদের জীবনমান উন্নত করা যায়, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি করা যায়। এটা না হলে দেশের নগরায়ণে আর্থিক উন্নতির হারও বাড়বে না এবং নগরায়ণের সাফল্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে না।

সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত নগরায়ণ কার্যকরী করতে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখার জন্যেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এজন্যে কঠিন বর্জ্য পুনরাবর্তন (Recycling) করার ব্যবস্থাও দরকার। এইসব বর্জ্য গর্তে সঞ্চিত করলে, ভূগর্ভস্থ জলের দূষণমাত্রা বাড়তে পারে। তাই এই বর্জ্য পুনরাবর্তনের উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে। এতে শহরে রেভিনিউ বাড়ার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হবে। নগরায়ণের জন্যে আর্থিক, সমতা ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে সুস্থিত ও সুস্থ পরিবেশ রক্ষাও সম্ভব হবে। অবশ্য কৃষিপ্রধান গ্রামীণ ভারতের মানুষদের কাছে নগরের সুযোগ সুবিধা দ্রুত পৌঁছে দেওয়াও সবথেকে জরুরি।❑

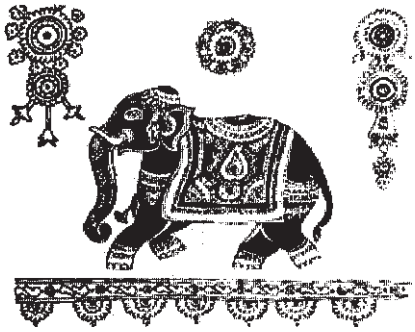

নগর উন্নয়ন, জনসংখ্যা ও বাসস্থান

শহরে দরিদ্রদের বাসস্থান গড়ে তোলার জন্য একাধিক সরকারি প্রকল্প রয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যা যেমন বাড়ছে, শহরাভিমুখী গ্রামবাসীর পরিমাণও বাড়ছে। ফলে শহর উত্তরোত্তর নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই সব নানা সমস্যার সঙ্গে যুঝবার জন্য প্রণীত হয়েছে নগরোন্নয়ন ও আবাসন সংক্রান্ত নানা নীতি। তারই ওপর আলোকপাত করেছেন **ইমন কল্যাণ জানা।**

নগর উন্নয়নকে সভ্যতার অগ্রগতির দিক নির্দেশকারী বলা চলে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারো, মেসোপটেমিয়া কিংবা মিশর বা গ্রিস থেকে একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান সময় পর্যন্ত নগর গড়ে উঠেছে, বিলুপ্ত হয়েছে ইতিহাসের তালে তালে। তবে শহর সব সময় গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করেই। তবে আগে গ্রামের মানুষ গ্রামে থেকে তাদের কাজ করত আর শহরের মানুষ থাকত শহরে। যাতায়াত থাকলেও শহরের দিকে পা বাড়ানো এবং সেখানেই বসবাস করবার প্রবণতা অতীতে ছিল না। এটা আধুনিককালের বৈশিষ্ট্য। এর পিছনে কারণও অনেক—যার মধ্যে প্রধান হল—রুজি রোজগার। কিন্তু এর ফলে সমস্যা দেখা দিচ্ছে অনেক। শহরে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পর্যাপ্ততা রক্ষা করতে গিয়ে মানুষকে সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়েছে এবং উপযুক্ত পরিকল্পনাসহ মানুষকে অগ্রসর হতে হয়েছে। আমরা এখন ভারতবর্ষের নগর উন্নয়নের সঙ্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে তাদের বাসস্থান নিয়ে আলোচনা করব।

নগরপত্তন অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ আয়ের ৬০ শতাংশ আসে নগর থেকে এবং সেই কারণে নগর এলাকাকে বৃদ্ধির ইঞ্জিন (Engines of Growth) বলা হয়ে থাকে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নগরায়ণকে ভারতবর্ষের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০০১-১১ এই দশকে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৭৬ শতাংশ ছিল যেটা পূর্ববর্তী দশকে ছিল ২.৭৪ শতাংশ। ইতিহাসগতভাবে অধিকাংশ নগর জীবনের জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে স্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে কিন্তু যত দিন যাচ্ছে এটা লক্ষ করা যাচ্ছে যে গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। অর্থাৎ যত দিন এগোচ্ছে, শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে মূলত গ্রাম থেকে শহরে মানুষের পা বাড়ানোর কারণে। তাই আশা করা হচ্ছে ২০৫০ সালে ভারতের নগরের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। ২০১১ সালে ভারতে বিধিসম্মত শহরের সংখ্যা ৪০৪১টি এবং ২০০১-১১ এই দশকে বিধিসম্মত শহরের সংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে ২৪২। ২০১১-এর জনগণনা তথ্য অনুসারে বিধিসম্মত শহরের সংখ্যা সর্বাধিক তামিলনাড়ুতে (৭২১টি) তারপর একে একে আসে উত্তরপ্রদেশ (৬৪৮টি), মধ্যপ্রদেশ (৩৬৪টি), মহারাষ্ট্র (২৫৬টি) এবং কর্ণাটক (২২০টি)। ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য মতে ভারতবর্ষে জনগণনা শহরের (census town) সংখ্যা ২০০১ সালের পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৬২টি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অধিকভাবে ৫২৮টি বৃদ্ধি পেয়ে সর্বাধিক জনগণনার শহর হয়েছে। মোট শহর ৭৮০টি। এই জনগণনার শহর ২০০১ সালে কেরালা, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশ ছিল যথাক্রমে ৯৯, ১১১, ১২৭ এবং ৬৬টি। ২০১১ সালে উক্ত রাজ্যগুলিতে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪৬১, ৩৭৬, ২৭৯, ২৬৭। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলি ভারতবর্ষে শহরকে দুটি বৈশিষ্ট্যে ভাগ করা যায়, সেটি নিম্নরূপ— 'In India, urban areas are defined on the basis of two criteria. First the State Govt. grants municipal status viz. Corporation, Municipal Council, notified town area committee or Nagar Panchayat, etc to an existing settlement. Such settlement are known as statutory or municipal towns in the census definition of urban areas. Second, if a settlement does not have an urban civic status, but satisfies demographic & economic criteria, like population more than 5000 density more than 400 persons per square kilometer and 75% make workforce in the non-agricultural sector, it can be termed as a census town.'

নগর সভ্যতার এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি হচ্ছে খুবই দ্রুতগতিতে। তার কিছু পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল—

জনসংখ্যা (কোটিতে)

	২০০১	২০১১	পার্থক্য
ভারত	১০২.৯	১২১.০	১৮.১
গ্রাম	৭৪.৩	৮৩.৩	৯.০
নগর	২৮.৬	৩৭.৭	৯.১

- স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রথমবার মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির নিরিখে গ্রামকে টপকে গেল নগর।
- গ্রাম নগরের জনবিন্যাস: ৬৮.৮৪ শতাংশ এবং ৩১.১৬ শতাংশ।

● নগরায়ণের বৃদ্ধি ২০০১ সালে ছিল ২৭.৮১ শতাংশ এবং ২০১১ সালে হয়েছে ৩১.১৬ শতাংশ।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (শতাংশ)

	১৯৯১-২০০১	২০০১-২০১১	পার্থক্য
ভারত	২১.৫	১৭.৬	–৩.৯
গ্রাম	১৮.১	১২.২	–৫.৯
নগর	৩১.৫	৩১.৮	+০.৩

এছাড়া সারা বিশ্বের নিরিখে বিষয়টা বিচার করলে দেখা যায় পৃথিবীর ৫০টি সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ নগরের মধ্যে শুধু ভারতবর্ষেই রয়েছে ১৭টি। যার মধ্যে ১২টি রয়েছে আমাদের এই রাজ্যে। এহেন একটি দেশের জনসংখ্যার চাপ নগরের প্রকৃত উন্নয়নের কাছে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। নগর উন্নয়নের অন্য অনেক দিকের মধ্যে আমরা এখানে মূলত বাসস্থানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

বাসস্থান নির্মাণ হল রাজ্যের একটি বিষয়। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের নীতি, পরিকল্পনা এবং তার সঠিক রূপায়ণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বিশেষ করে সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষের জন্য নগর দারিদ্র এবং বাসস্থান মন্ত্রক (Ministry of Housing and Urban Poverty) জাতীয় স্তরে প্রধান সংস্থা হিসাবে কাজ করে বাসস্থান নীতি ও পরিকল্পনা তৈরিতে, পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপায়ণের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে, বাসস্থান সংক্রান্ত তথ্য আহরণে, গৃহ নির্মাণের ব্যয় কমানোর সাধারণ পদ্ধতি এবং গৃহ নির্মাণের সামগ্রী ও প্রযুক্তি সংগঠনে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকরী কিছু পরিকল্পনা আলোচিত হল, যেগুলি নগরের জন্য গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

নগরে বাসস্থান ও বসবাস সংক্রান্ত জাতীয় নীতি

খাদ্য ও বস্ত্রের পরেই বাসস্থান একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মানুষের জন্য। ভারতবর্ষের নগরের বৃদ্ধি ও নগরের জনসংখ্যার বিস্ফোরণের কারণে দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাসস্থানের অভাব হবে ২৪.৭ মিলিয়ন। শুধুমাত্র এই বাসস্থানের অভাব মেটানো নয়, এর সঙ্গে লক্ষ রাখতে হবে এটা মেটানো যেন হয় স্থিতিশীল উন্নয়নের হাত ধরেই। অর্থাৎ বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে যেন নগরের নিকাশি ব্যবস্থা, শৌচাগার, বিদ্যুৎ, রাস্তা, বাহিত জল, কঠিন বর্জ্যের ব্যবহার ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিও সঠিকভাবে রূপায়িত হতে পারে। এই সকল বিষয় এবং বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে সরকার মনে করছে যে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ দিয়ে চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তাই কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারি ক্ষেত্রকে...সমবায় ক্ষেত্র, শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য শিল্প ক্ষেত্র এবং চাকুরিজীবীর বাসস্থানের জন্য সংস্থা ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। এই সকলকে একত্রিত করে একটি সুসংহত বাসস্থান নীতি তৈরি করার জন্য ২০০৭ সালে চালু হয় জাতীয় বাসস্থান ও বসবাসনীতি (NUHHP)।

জওহরলাল নেহরু নগর পুনর্নবীকরণ সংক্রান্ত জাতীয় মিশন

শহর ও টাউন মিলিয়ে ভারতের নগরায়ণের উন্নতিকল্পে ২০০৫ সালের ৩ ডিসেম্বর জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর পুনর্নবীকরণ মিশন চালু হয়েছে। সমগ্র মিশন বা প্রকল্পটির দুটি আলাদা বিভাগ রয়েছে। একটি হল নগরের গরিবদের জন্য মূল পরিষেবা (BSUP) এবং অপরটি নগরের পরিকাঠামো ও প্রশাসন (UIG)। এর মধ্যে (BSUP) প্রযোজ্য হয়েছে ৬৫টি নগরের জন্য। এই প্রকল্পটির মেয়াদকাল ৭ বছর (২০০৫-১২) এবং এটির বর্ধিত সময়সীমা হল ২০১৪। ছোট শহরগুলির জন্য রয়েছে দুটি প্রকল্প—ছোট ও মাঝারি শহরগুলির জন্য পরিষেবা বিকাশ প্রকল্প (UIDSSMT) এবং সুসংহত আবাসন ও বস্তি বিকাশ প্রকল্প (IHSDP)। জওহরলাল নেহরু নগর পুনর্নবীকরণ সংক্রান্ত জাতীয় মিশনের এই দুটি শাখা তাৎপর্যপূর্ণভাবে লিপ্ত রয়েছে নগরের গরিব, পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য বাসস্থান সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার ব্যবস্থা করার জন্য। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন নগরের উন্নয়ন করতে হলে কোনও একটি বিষয় নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে তা করা উচিত নয়। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে বাসস্থান, পানীয় জল, বর্জ্য পদার্থের ব্যবহার ইত্যাদি করা হলে সেটি সুস্থিত ও স্থায়ী উন্নয়ন হয় না। মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনায় মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম মূলগত পরিকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন। এর মধ্যে বাসস্থান একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

রাজীব আবাস যোজনা

বস্তিমুক্ত ভারতবর্ষ নির্মাণের লক্ষ্যে ভারত সরকার ২০১১ সালের ২ জুন রাজীব আবাস যোজনা চালু করে। এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর প্রথম দশায় সময়কাল ছিল ২ বছর। বস্তিবাসীদের একটি সুস্থ, স্বাভাবিক সুন্দর বাসস্থান এবং পৌর পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে বস্তির পুনরুন্নয়নের জন্য বস্তিবাসীদের অধিকার সুরক্ষিত করার কাজে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের (২০১২-১৭) মধ্যে দেশের ২৫০টি নগরের জন্য এই প্রকল্পটি চালু রয়েছে। কোন নগর এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে সেটা কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। রাজ্যকে JNNURM-এর আওতাভুক্ত সমস্ত নগরকে এর মধ্যে ঢোকানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিশেষ করে ২০০১ সালের জনগণনা মতে ৩ লক্ষের অধিক জনসংখ্যার নগর, ছোট শহরের মধ্যে সংখ্যালঘু মানুষ অধ্যুষিত নগর, যে সকল ছোট নগরে খুব দ্রুত হারে বস্তির বৃদ্ধি হচ্ছে সেই সকল জায়গাতে রাজীব আবাস যোজনা প্রযোজ্য। রাজীব আবাস যোজনার প্রস্তুতি দশাতে ১৬২টি নগরের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বস্তিমুক্ত নগর পরিকল্পনা খাতের প্রস্তুতি পর্বে। এছাড়া আরও ৮টি পাইলট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ৪৪৬.২২ কোটি টাকার। যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সাহায্য থাকবে ১৯৭.০৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৮৪০০টি বাসগৃহ তৈরি হবে। প্রথম ইনস্টলমেন্টে ৬৫.৬৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে উদ্দিষ্ট রাজ্যগুলিতে।

এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হল নগর এলাকার গরিবদের সাধ্যের মধ্যে

বাসস্থান নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রবাহ ঠিক রাখা।

রাজীব ঋণ যোজনা

রাজীব ঋণ যোজনা হল আর একটি প্রকল্প যার মাধ্যমে নগরের EWS/LIG অংশের মানুষের বাসস্থান নির্মাণের জন্য বর্ধিত হারে ঋণের ব্যবস্থা করা। একাদশ পরিকল্পনাবর্ষে RRY তৈরি হয়েছে নগরের গরিবদের জন্য সুদ ভরতুকি প্রকল্পকে (ISHUP- INTEREST SUBSIDY SCHEME FOR THE URBAN POOR) পরিবর্তিত করে যাতে এর ক্ষেত্রকে আরও বর্ধিত করা যায়। RRY প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে সারা দেশের সমগ্র নগর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এটি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় প্রকল্প। এই প্রকল্পে EWS এবং LIG ক্ষেত্রের মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ বা গৃহ বর্ধিতকরণের জন্য ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে যার মধ্যে ঋণের সুদের ওপর ভরতুকি থাকে ৫ শতাংশ। যদিও এই ঋণের ঊর্ধ্বসীমা EWS-দের জন্য ৫ লক্ষ এবং LIG-দের জন্য ৪ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ঋণের সুদের ওপর ভরতুকি প্রযোজ্য প্রথম ৫ লক্ষ টাকার ওপর। নগরের স্থানীয় সংস্থার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই প্রকল্প সঠিকভাবে প্রয়োগের বিষয়ে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং নগরায়ণ যেভাবে ঘটেছে সেটা খুবই উদ্বেগের। আবার দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নিরিখে সেটা ভালোও। যদি সেই জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে দেশের অগ্রগতির স্বার্থে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। এরজন্য প্রয়োজন জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ভারতবর্ষের নগর সভ্যতার মানুষের জীবনযাত্রার মানের প্রধান বাধা হল জনসংখ্যার চাপ জনিত সমস্যার সঙ্গে সঠিক পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নের অভাব। জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করতে হলে সকল প্রকার আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমূহ যাতে মানুষ পেতে পারে সেগুলির দিকে সঠিক দৃষ্টি রাখা। পরিষেবার মধ্যে অন্যতম হল বাসস্থান, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, পরিবহণ এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উপলব্ধতা। এই সকল পরিষেবা একে অন্যের ওপর অঙ্গাঙ্গিভাবে নির্ভরশীলও বটে। যেমন কোনও নগরে বা পৌর অঞ্চলে অবস্থানকারী মানুষের কাছে সঠিকমাত্রায় পানীয় জল পৌঁছে দিতে গেলে আগে প্রয়োজন তাদের নির্দিষ্ট গৃহ এবং নির্দিষ্ট সংখ্যায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা। যার ওপরে ভিত্তি করে পানীয় জলের সরবরাহ হয়ে থাকে। আবার আমাদের মতো দেশে যেখানে ফুটপাথবাসী এবং বস্তিবাসীর সংখ্যা প্রচুর, এরা কোনও নগরের পরিবহণ ব্যবস্থার কাছে একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। নগরের যানবাহনের গতি অনেক কমে যায় এবং দুর্ঘটনার মাত্রা বেড়ে যায় এই ফুটপাথবাসী এবং বস্তিবাসীদের জন্য। এছাড়া এই দুই জায়গায় সাধারণভাবে পৌর পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াও একটি দুরূহ ব্যাপার। বসবাসের পক্ষে এই পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকরও বটে। বস্তি অঞ্চলে অতি অল্প স্থানে এত অধিক সংখ্যক মানুষের বসবাস যে সেখানে যথেষ্ট আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। তাই সেই সকল অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না। এহেন অবস্থায় সারা দেশের সমস্ত নগরের বসবাসকারী মানুষের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা খুবই দরকার। যে ব্যবস্থায় সকল প্রকার আয়ের মানুষদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে। নিম্ন আয়ের মানুষদের ক্ষেত্রে অবশ্যই সকল প্রকার সরকারি সাহায্য থাকা প্রয়োজন। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সাহায্যই নয় প্রযুক্তিগত সাহায্যও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ বাসস্থানকে হতে হবে পরিবেশ বান্ধব ও স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মিত। দেখতে হবে, পৌর পরিষেবাও যেন সঠিকভাবে সেখানে পৌঁছতে পারে। যেমন বিদ্যুৎ, পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ইত্যাদির পর্যাপ্ত সুব্যবস্থা গড়ে তুলে তবেই বাসস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত।❑

তথ্যসূত্র :

১. http://www.censusindia.gov.in

২. INDIA 2014; PUBLICATION DIVISION. GOVT. OF INDIA

৩. উইকিপিডিয়া

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

নগরায়ণ পরিকল্পনা ও পরিচালনা

কেরিয়ার অপশন প্রচুর

উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে নগরায়ণ বাড়ছে। গড়ে উঠছে নতুন নতুন শহর—স্মার্ট শহর। নিয়ন্ত্রিত নগরায়ণের জন্য দরকার উন্নত পরিকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা। তার জন্য দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনার। সে জন্য আজ বিশ্বজুড়ে চাহিদা আরবান প্ল্যানিং ও ম্যানেজমেন্ট পেশাদারদের—লিখছেন **কল্যাণ মৈত্র।**

আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এই যুগের আকর্ষণীয় পেশা। নগর পরিকল্পনা ও পরিচালনা ঘিরে রয়েছে অনেক কাজ, অনেক চাকরির সুযোগ। পুরোনো শহরকে ঘিরে গড়ে উঠছে নতুন শহর, ঐতিহ্যবাহী শহরকে বা নগরকে ঘিরে গড়ে উঠছে উপনগরী বা স্যাটেলাইট টাউনশিপ। গ্রাম ঢুকে পড়ছে শহরে। শহরের আধুনিকতা ঢুকে পড়ছে গ্রামে। তার কারণ জনবিস্ফোরণ। জনসংখ্যার চাপে নগরায়ণ, নতুন নতুন শহর গড়ে উঠছে। রাষ্ট্রসংঘের একটি হিসেব বলছে, ২০৩০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে ৮৩০ কোটি। আর এই জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ বাস করবে শহরে। জনসংখ্যার এই চাপ সহ্য করতে তৈরি হবে নতুন নতুন বাড়ি, শপিং মল, টাউনশিপ, স্যাটেলাইট টাউন, সেতু, রাস্তা, ফ্লাই-ওভার। দরকার হবে সম্প্রসারিত পরিবহণ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিকাঠামো, বিনোদন কেন্দ্র, বাজার ও বিপণন কেন্দ্র। এককালে শহর গড়ে উঠত নিজের খেয়ালে। পরে প্ল্যানড সিটি কনসেপ্ট এল। গ্রামকেও সেতু ও রাস্তা দিতে গিয়ে নতুন করে পরিকল্পনা করার কথা ভাবা হল। এই যে আরবানাইজেশন বা নগরায়ণ তার জন্যে এখন প্রয়োজন পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিকাঠামো। যেভাবে নগরায়ণ, পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিতভাবে হচ্ছে তাতে বিগত কয়েক দশক ধরে সরকার, সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি নগরায়ণ তার পরিকল্পনা ও পরিচালন ব্যবস্থার জন্য স্থায়ী সমাধান খুঁজতে চাইছিল। এই ঘটনা শুধু আমাদের দেশে নয় ইউরোপ ও আমেরিকাতেও বলা ভালো সমগ্র বিশ্বে একই রকম। উন্নয়নের কাজ যেমন সরকার করে তেমনই বেশকিছু কাজ রয়ে যায় বেসরকারি হাতে। একসময় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা আর্কিটেক্ট যাদের আমরা স্থপতি এবং বাস্তুকার বলছি তারাই মূল দায়িত্ব সামলে দিতেন। কিন্তু সময় বদলেছে। এখন শুধু বাড়িঘর বা সেতু, শপিং মল বানানো নগরায়ণের শেষ কথা নয়। এর সঙ্গে রয়েছে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র-ভাবনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, জমির ক্ষেত্রে শিল্প ও কৃষির সাম্য ও চাহিদা। একালের স্থপতিরা শুধু ইমারত গড়েন না। তাঁরা শহর গড়েন, শিল্প গড়েন, পরিকাঠামো তৈরি করেন, পাহাড়ের ওপরে বা সমুদ্রের নীচে অথবা মরুভূমির বুকে মানুষের চাহিদামতো কত কিছুই না গড়ে থাকেন। তার ওপর মূল ভাবনা হল আগামী দিনে শক্তির নিরাপত্তার কথা ভেবে নগরায়ণ পরিকল্পনা। তার সঙ্গে রয়েছে গ্রিন লিভিং কনসেপ্ট। এই সব কিছুর জন্য প্রয়োজন প্রচুর পেশাদার। যাঁরা নগরায়ণ এবং নগর উন্নয়নের কাজ করে থাকেন তাঁদের ওপর এই পরিকল্পনা ও পরিচালনার বাড়তি দায়িত্ব বর্তেছে। কীভাবে নগরায়ণ হবে, কীভাবে বিনিয়োগ হবে, কীভাবে সাশ্রয় করতে হবে সেইসব ভাবনা আজ এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। এইজন্য দরকার জিও- ইনফরমেশন এবং জিও-ইনফরমেশন টেকনোলজি। সুষ্ঠুভাবে ও স্থায়ী পরিকল্পনার নিরিখে নগরায়ণ করতে হলে ভূতাত্ত্বিক তথ্য ও সেই সংক্রান্ত প্রযুক্তি আজ সবার আগে দরকার হয়ে পড়ে। নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নগরায়ণের আগে আজকাল দেখে নিতে হয় এলাকার পরিবেশ, পরিস্থিতি, পরিবহণ ব্যবস্থা, জনপরিচয়, জন-পরিষেবা, জমি। এইজন্য দরকার বিষয়ভিত্তিক পেশাদার যারা আরবান প্ল্যানিং ও ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল বলে পরিচিতি।

যাঁরা গতানুগতিক বিষয় ছেড়ে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, আধুনিক চাহিদা মেনে কেরিয়ার গড়তে চান তাঁদের ক্ষেত্রে আরবান প্ল্যানিং ও ম্যানেজমেন্ট আকর্ষণীয় হতে পারে। আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট-এ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স, এমনকী পিএইচ.ডি-ও করা যায়। রয়েছে সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম।

আরবান প্ল্যানিং কী?

নগরায়ণ পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে জমির ব্যবহার, হাউজিং এবং পরিবহণ পরিকল্পনা। যে এলাকায় একটি নতুন শহর গড়ে উঠবে সেখানে জমির অবস্থা কীরকম, জমি পাওয়া সম্ভব কিনা, পেলেও তার গুণাগুণ বিচার করার দরকার। এই কাজগুলি করে থাকেন আরবান প্ল্যানিং পেশাদাররা। এদের কাজ হল নতুন নগরীর বা কোনও নগরীর কোনও একটি বিশেষ প্রকল্পের নকশা তৈরি করা। সেখানকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির গ্রাফ তৈরি করা। যাঁরা আরবান প্ল্যানিং নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পড়েন তাঁরা এইসব বিষয়েই জ্ঞান অর্জন করেন। ফিল্ডে গিয়েও এদের কাজ করতে হয়। যারা মাস্টার্স করেন তাঁদের গবেষণার কাজও করতে হবে।

কেন পড়বেন, কখন পড়বেন, কী পড়বেন?

উচ্চমাধ্যমিকের পর আরবান প্ল্যানিং নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পড়া যায়। নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করলে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়ার সুযোগ অনেক। একটি বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। জনসংখ্যার চাপ যত বাড়বে নগরায়ণ তত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। সেই কারণে দরকার হবে নতুন প্রযুক্তি, নতুন ভাবনা ও নতুন অর্থনৈতিক চিন্তা। সেই কারণে পেশাদারদেরও নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। এই পেশাদারদের চাহিদা আগামী দিনে বাড়তেই থাকবে। আরবান প্ল্যানিং পেশাদাররা বা প্রফেশনাল আরবান প্ল্যানাররা শুধু নকশা তৈরি করেন না, তারা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি, ইতিহাস, আইন-কানুন, অর্থনীতি এবং জননীতির বিষয়গুলিতেও সজাগ থাকেন।

এই ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাস প্রতিষ্ঠান নিরিখে অনেকটা আলাদা হলেও মূল ভাবনাগুলি বলতে গেলে একই। কোথাও কোথাও লিবার‍্যাল আর্টস কোর্সগুলির সঙ্গে

আরবান প্ল্যানিং পড়ানো হয়। ফিল্ড ওয়ার্ক এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের সঙ্গেই যুক্ত থাকে। এদেশের প্রতিষ্ঠিত রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলি এবং নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলি এখন এই ধরনের পেশাদার নিয়োগের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। ডিগ্রি কোর্সে পড়তে হয়—আরবান ডিজাইন হিস্ট্রি, ল্যান্ড ইউজ প্ল্যানিং, আরবান প্ল্যানিং ল, এনভায়রনমেন্টাল প্ল্যানিং ইস্যুজ ও হিস্টোরিক প্রিজারভেশন।

কেরিয়ার অপশন

এবারে প্রশ্ন উঠতে পারে, এক্ষেত্রে কেরিয়ার অপশন কী কী? ডিগ্রি নিয়ে প্রফেশনাল আরবান প্ল্যানার তো হওয়া যায়ই। এছাড়াও রয়েছে আরও কিছু স্পেশালাইজড কেরিয়ার। যেমন পাবলিক পার্ক ডিজাইনার, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল, এক্সপার্ট অন হিস্টোরিক বিল্ডিং রেস্টোরেশন।

মাস্টার ডিগ্রি করা থাকলে সুযোগ অনেক। এই ডিগ্রি মূলত স্কুল অব আর্কিটেকচার কিংবা পাবলিক সার্ভিস ইন্সটিটিউশন দিয়ে থাকে। এই স্তরে শহর ও শহর উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিতভাবে জ্ঞান অর্জন করা যায়। রয়েছে গবেষণার সুযোগ। মাস্টার্সে পড়তে হয় স্টাকচার অফ সিটিস, প্ল্যানিং নিগোসিয়েশনস, ল্যান্ড ইউজ ফর ট্রান্সপোর্টেশন, ইন্টারন্যাশনাল সাসটেনেবল লিভিং, পাবলিক ফিনান্সিং। এছাড়াও পড়া যায় মাস্টার অফ সিটি প্ল্যানিং, মাস্টার অফ কমিউনিটি প্ল্যানিং, মাস্টার অফ প্ল্যানিং, মাস্টার অফ এনভায়রনমেন্টাল প্ল্যানিং, মাস্টার অফ আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার স্ট্যাটিসটিকস-এর দেওয়া একটি তথ্য বলছে এক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ ১৬ শতাংশ হারে বাড়ছে। যাঁরা আরও বেশি এগোতে চান, পড়তে চান তাঁরা পরবর্তীকালে কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট, প্ল্যানিং সাসটেনেবল কমিউনিটিজ, ওয়াটার সাপ্লাই প্ল্যানিং, কমিউনিকেশনস অ্যান্ড প্ল্যানিং, চেঞ্জিং ফর্ম অফ দ্য সিটি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পড়তে পারেন। এমনকী এই বিষয়গুলিতে পিএইচ.ডি ও করা যায়। আর তা করা থাকলে একজন পেশাদার পরবর্তীকালে একজন অধ্যাপক, গবেষক বা কনসালটেন্ট হতে পারেন। এমনকী উদ্যোগপতি বা নির্মাণশিল্পপতি হওয়া সম্ভব। একটি হিসেব বলছে আমাদের দেশে এই ধরনের পেশাদারদের ৫৬ শতাংশ প্রশাসনে বিশেষ করে পুরসভায় কর্মরত। ২১ শতাংশ যুক্ত রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে। গত কয়েক দশকে এই পেশাদারদের চাহিদা বেসরকারি ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

আরবান প্ল্যানিং ও ম্যানেজমেন্ট

আরবান প্ল্যানিং-এর পর হল ম্যানেজমেন্ট। নগরায়ণকে কীভাবে পরিচালনা করা হবে—সেখানেও দরকার পেশাদারদের। এই ধরনের ম্যানেজমেন্ট পেশাদাররা শহরের ভাবী উন্নয়নের দিকে নজর দেন, নজর দেন উন্নয়নের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও। আরবান প্ল্যানিং ম্যানেজারদের এখন চাহিদা বিস্তর। একটি উন্নয়নশীল বা গড়ে উঠছে এমন একটি পরিকল্পিত শহর বা একেবারে নতুন একটি প্রস্তাবিত শহরের চেহারা কেমন হবে সেইটি তৈরি করেন এই পেশাদাররা। নগর পরিবহণ, পরিকাঠামো, সামাজিক পরিষেবা, জীবনযাত্রার মান, আপৎকালীন সুরক্ষা এবং সংকট মোকাবিলা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের গভীরতা থাকে। বিদেশের অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে এমএসসি পড়ানো হয়। এছাড়াও জিও-ইনফরমেশন সায়েন্স ও আর্ট অবজারভেশন এই কোর্সের অন্যতম দুটি বিষয়। আর্কিটেকচার স্কুলে আরবান প্ল্যানিং যেভাবে পড়ানো হয়, সেভাবে পাবলিক পলিসি স্কুলে পড়ানো হয় না। আর্কিটেকচার স্কুলে বা ডিজাইনিং স্কুলে পরিকল্পনা ও নকশার ওপর জোর দেওয়া হয়। ওদিকে পাবলিক পলিসি স্কুলে জননীতি ও প্রশাসন নিয়ে জোর দেওয়া হয়। আমরা আগেই বলেছি, পড়ার সঙ্গে কেরিয়ার অপশন এখানে অনেক। স্কুলগুলি ডিগ্রি করানোর সময়ে স্পেশালাইজেশনের কথা বলে। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর চাহিদামতো কোর্স দেওয়া হয়। যেমন চাইলে জমিনীতি, জমিসংক্রান্ত আইন, পরিবেশ সুরক্ষা, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বা জিআইএস নিয়ে স্পেশালাইজেশন করা যায়।

নগরায়ণের চাহিদাকে সামনে রেখে কিছু প্রতিষ্ঠান আরবান প্ল্যানিং বিষয়টিকে ৪ বছরের ডিগ্রিকোর্সের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় জিওগ্রাফিতে ডিগ্রিকোর্স পড়ানোর সময় আরবান প্ল্যানিং পড়ানো হয়। কোনও কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিএ আরবান প্ল্যানিং বা বিএসসি আরবান প্ল্যানিং আলাদা করে পড়ানো হয়। কোথাও কোথাও সোসিওলজির সঙ্গে আরবান প্ল্যানিং পড়ানো হয়। অনেক জায়গায় বিএসসি প্ল্যানিং অ্যান্ড রিয়েল এস্টেট পড়ানো হয়। নাম আলাদা হলেও কোর্সের বিষয়বস্তু প্রায় এক।

আরও বেশি জানতে হলে ওয়েবসাইট দেখুন। বিদেশি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বিষয়গুলি পড়ায়। এদেশে কোথায় কোথায় পড়তে পারেন তার একটি হদিশ এখানে দেওয়া হল। দ্য ইন্সটিটিউট অফ টাউন প্ল্যানার্স ইন্ডিয়া (আইটিপিআই)-এর আওতায় দেশের যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার বছরের আরবান প্ল্যানিং-এ ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয় তা এইরকম—

- স্কুল অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার, নিউ দিল্লি।
- স্কুল অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার, বিজয়ওয়াড়া, অন্ধ্রপ্রদেশ।
- স্কুল অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার, ভূপাল, মধ্যপ্রদেশ।
- স্কুল অফ প্ল্যানিং, ভৈকাকা সেন্টার ফর হিউম্যান সেটেলমেন্টস, বল্লভ বিদ্যাননগর, আনন্দ, গুজরাত।
- মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি, ভূপাল, মধ্যপ্রদেশ।
- সর্দার বল্লভভাই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি, সুরাট, গুজরাত।
- ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি, খড়গপুর।
- ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি, রুরকি, উত্তরাখন্ড।
- পুণে ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, পুণে।
- কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, পুণে।
- সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল প্ল্যানিং অ্যান্ড টেকনোলজি, আমেদাবাদ।
- গুরু নানকদেব ইউনিভার্সিটি, অমৃতসর, পঞ্জাব।
- আন্না ইউনিভার্সিটি, চেন্নাই, তামিলনাড়ু।
- ইউনিভার্সিটি অফ মাইশোর, কর্ণাটক।
- বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, পশ্চিমবঙ্গ।
- মালব্য ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি, জয়পুর, রাজস্থান।
- কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, তিরুবনন্তপুরম, কেরালা।
- বিড়লা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড।
- জওহরলাল নেহরু টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, হায়দরাবাদ।❑

ভারত কি ‘সপ্রতিভ’ শহুরে ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় প্রস্তুত?

পরিকল্পিত নগরোন্নয়নের মাধ্যমে দেশে ভবিষ্যতে ‘সপ্রতিভ’ শহর গড়ে তোলার যে লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, তার সুচারু রূপায়ণে প্রয়োজন যথার্থ পরিকল্পনা শিক্ষা। দেশে পরিকল্পনা শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি, নানা প্রতিবন্ধকতা এবং তার মোকাবিলায় বিবিধ ভাবনা ও সুপারিশ এই নিবন্ধে তুলে ধরেছেন দুই লেখক **ড. রলি অরণ্য** এবং **চেতন বৈদ্য।**

ভারতে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

‘পরিকল্পিত নগরোন্নয়নের মধ্যেই নিহিত ভারতের বিকাশ’—কেন্দ্রীয় সরকারের নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে উদ্দেশ্যবার্তায় এই বাক্যটি লেখা রয়েছে। সাম্প্রতিক সাধারণ বাজেট এবং নতুন সরকারের নীতিসমূহেও দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের সুনির্দিষ্ট পন্থা হিসাবে সুপরিকল্পিত নগরায়ণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাজেটে নজর দেওয়া হয়েছে আবাসন সংক্রান্ত সমস্যা এবং শহরাঞ্চলে থাকা দরিদ্র মানুষদের আবাসনের জন্য অর্থের জোগানের ওপর। অগ্রাধিকারের এই ক্ষেত্র চয়ন অবশ্যই যুক্তিসংগত, কিন্তু মূল প্রশ্ন হল, আধুনিকীকরণ ও দারিদ্র দূরীকরণের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে নগরোন্নয়নের যথাযথ পরিকল্পনা কি আমাদের দেশের প্রণয়ন করা হচ্ছে?

ভারতে নগরোন্নয়ন পরিকল্পনার ‘ব্যর্থতা’ নিয়ে বেডরুম থেকে বৈঠকখানা—সর্বত্রই বিস্তর আলোচনা হয়। প্রতিদিন ভিড়ে ভর্তি, বিশৃঙ্খল, দূষণপূর্ণ, পরিকাঠামোহীন যে জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা শহরবাসীকে ভোগ করতে হয়, তার প্রতিকারের জন্য কোনও শাসন কর্তৃপক্ষের দেখা মেলে না। অগত্যা বলির পাঁঠা হয়ে দাঁড়ান পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরাই। সেজন্যই প্রয়োজন ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তবমুখী পরিকল্পনার। এই পরিকল্পনা যাতে বর্তমানের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণেও সমান উপযোগী হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

বিপুল সংখ্যার চ্যালেঞ্জ

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে দেশের শহরাঞ্চলে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ জন বস্তিতে এমন পরিবেশে বাস করেন, যা মানুষের থাকার অনুপযোগী। এর অর্থ হল, শহুরে বাসিন্দাদের প্রতি পাঁচজনের একজন, মৌলিক পরিকাঠামো ও ভদ্রস্থ জীবনযাত্রার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই জনগণনা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে এনেছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম গ্রামের তুলনায় শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। দেশের জনসংখ্যার ৩২ শতাংশ অর্থাৎ ৩৭ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ শহরে বাস করেন। ১৯৯১ সাল থেকে প্রতি দশকে এই হার ৩১-৩২ শতাংশ করে বাড়ছে। অন্যদিকে ২০০১ সাল থেকে বস্তির জনসংখ্যার হার প্রতি দশকে বাড়ছে ৩৭ শতাংশ করে।

ভারতীয় নগর পরিকাঠামো ও পরিষেবা বিষয়ক একটি প্রতিবেদনে (HPEC Report, March 2011) দেখা যাচ্ছে, দেশের অধিকাংশ শহরেই পরিকাঠামো বাবদ বিনিয়োগে ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে। ২০১২ থেকে ২০৩১ সালের সময়সীমায় নগর পরিকাঠামোর জন্য আনুমানিক ৩৯.২ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রয়োজন। অর্থাৎ ২০১১-১২ সালে নগর পরিকাঠামোর জন্য খরচের ০.৭ শতাংশ হারকে ২০৩১-৩২ সালে ১.১ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। কেবল বাস্তব পরিকাঠামোতেই নয়, বিনিয়োগ প্রয়োজন শাসন ও পরিষেবা প্রদানের মানোন্নয়নের লক্ষ্যেও।

অসংগঠিত ক্ষেত্র ও অসাম্যের চ্যালেঞ্জ

ভারতীয় অর্থনীতির সিংহভাগ জুড়েই অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রাধান্য। ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজেস ইন দ্য আনঅর্গানাইজড সেক্টর—NCEUS-এর ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, দেশের কর্মসংস্থানের ৮৬ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রের এমন বিস্তারের জেরে স্বাভাবিকভাবেই নগরোন্নয়নে অধিকাংশ উদ্যোগও সংগঠিত, পরিকল্পিত শহরের বাইরেই করতে হয়। জমির অসংগঠিত বাজার, অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ ও উন্নয়ন আজ সর্বত্র দেখা যায়। সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করে তোলে আয়ের অসাম্য এবং চাকরি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা। এই সুযোগ-সুবিধা কেবলমাত্র সংগঠিত ক্ষেত্রেই মেলে। রাষ্ট্রসংঘের জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন জানাচ্ছে, ১৯৯৫ ও ২০০৫ সময়কালের মধ্যে ভারতে শহুরে ক্ষেত্রে অসাম্য ৩৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৮ শতাংশ হয়েছে। (ইউ এন হ্যাবিটেট ২০১০)।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের বিশ্বজনীন চ্যালেঞ্জ

অসাম্য ও দারিদ্রের জেরে ভারতের শহরে বসবাসকারীরা মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে আরও বেশি করে অসহায় হয়ে পড়েন। বিশ্বব্যাংকের শহর ও জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে (বিশ্ব ব্যাংক ২০১০) দেখা যাচ্ছে, নীচু এলাকা ও উপকূলভাগে বাস করা মানুষের সংখ্যার নিরিখে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়। সমুদ্রের জলস্তর বাড়লে এই ৩ কোটি মানুষ চরম বিপদে পড়বেন। চীনে এই বিপদ সব থেকে বেশি। সেখানকার ৮ কোটি মানুষ বাস করেন এইসব এলাকায়। দেখা গেছে, ভারতের ৭০ শতাংশ মানুষ বন্যা এবং ৬০ শতাংশ মানুষ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় বাস করেন। সেজন্য ভারতকে বিশ্বের সব থেকে দুর্যোগপ্রবণ দেশ বলা হয়। (ইউএনডিপি ২০১৪)। অত্যধিক জনঘনত্ব ও জনসংখ্যার বিশালত্বের জন্য শহরাঞ্চলে ঝুঁকির মাত্রা আরও বেশি।

প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ

ভারতের শহরগুলির অবস্থা ও সম্ভাব্য বিকাশ নিয়ে সাম্প্রতিককালে তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এর একটি হল ম্যাকিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের, ইন্ডিয়ান আরবান অ্যাওয়েকেনিং রিপোর্ট ২০১০, অপরটি এইচপিইসি রিপোর্ট অন ইন্ডিয়ান আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড সার্ভিসেস ২০১১ এবং তৃতীয়টি কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের ন্যাশনাল মিশন অন সাসটেইনেবল হ্যাবিটেট রিপোর্ট—NMSH, 2010. তিনটি প্রতিবেদনই একমত যে, ভারতে নগরোন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা খণ্ডিত, কেন্দ্রীভূত এবং জমির ব্যবহার নিয়ে মান্ধাতার আমলের ভাবনাবাহী। নগরোন্নয়ন, আবাসন ও দারিদ্র দূরীকরণ মন্ত্রকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এ সংক্রান্ত পরিকল্পনাও সার্বিক হওয়ার পরিবর্তে খণ্ডিত। ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী বিলের ঘোষিত উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজকে এখনও বিকেন্দ্রীভূত করা যায়নি। জমি ব্যবহার বিষয়ক পরিকল্পনায় রাজ্যের সংস্থাগুলির অবদান প্রায় শূন্য। দরিদ্রদের জন্য আবাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা প্রভৃতি সামাজিক উদ্দেশ্যগুলি রূপায়ণে পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির। এগুলিকে মাস্টার প্ল্যান বা প্রধান পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কোনও উদ্যোগ নেই। সরকারি প্রয়াসে জওহরলাল নেহরু নগর পুনর্নবীকরণ মিশনের মতো কর্মসূচি অবশ্যই সঠিক দিশায় করা পদক্ষেপ, কিন্তু বিকেন্দ্রায়িত ও সংযুক্ত পরিকল্পনার স্বপ্ন সফল করতে এখনও অনেক দূর যেতে হবে।

সুস্থিত প্রগতিশীল শহরের পরিকল্পনার জন্য কেমন ধরনের পরিকল্পনাকারী প্রয়োজন?

নতুন সরকার ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য 'সপ্রতিভ' নগরায়ণের স্বপ্ন দেখে। তাই এটাই সঠিক সময় সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলি এবং তার মোকাবিলায় আমাদের সামর্থ্য পরিমাপের। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধাঁচে কেবল প্রযুক্তিগত আধুনিকতায় সীমাবদ্ধ থাকলে ভারতে 'স্মার্ট সিটি' মডেল ফলপ্রসূ হবে না। ভারতের এমন সপ্রতিভ নগরায়ণ প্রয়োজন যা একইসঙ্গে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অর্থনৈতিকভাবে বৈচিত্রপূর্ণ হবে।

সাধারণ বনাম বিশেষজ্ঞ

আসল প্রশ্ন হল, এই জটিল কাজের জন্য আমাদের কেমন ধরনের পরিকল্পনাকারী ও কী ধরনের পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রথমে পরিকল্পনাকারীকে নিয়ে আলোচনা করা যাক। ব্রিটিশ ও মার্কিনদের টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং এডুকেশন থেকে ভারতে পরিকল্পনা সংক্রান্ত শিক্ষার সূত্রপাত। বরাবরই এখানে সাধারণ বনাম বিশেষজ্ঞের বিতর্কটি উঠেছে। স্বাধীনতার পর যখন প্রথম শহর পরিকল্পনা আইন প্রণয়ন করা হল, তখন পরিকল্পনাকারীদের ভূমিকা রাজ্য ও শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জমি ব্যবহারের প্রাথমিক পরিকল্পনাকে বলা হত মাস্টার প্ল্যান। পরিকল্পনাকারীকে একজন কারিগরি বিশেষজ্ঞ মনে করা হত। যিনি বিভিন্ন ক্ষেত্র ও সংস্থার থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করবেন। এই ভূমিকাকে বলা যায় জমি ব্যবহারের সাধারণ পরিকল্পক। ১৯৯১ সালে উদারীকরণের আগে পর্যন্ত, শহরের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ মূলত রাজ্য সংস্থাগুলিই করে এসেছে। উদারীকরণের পর আবাসন, জমি উন্নয়নের মতো ক্ষেত্র থেকে সরকারি সংস্থাগুলি ক্রমশ সরে আসতে থাকে। এটি উন্মুক্ত হয়ে যায় বহু ধরনের সংস্থার সামনে। নগরোন্নয়ন ক্ষেত্রে দেখা যেতে থাকে বেসরকারি সম্পত্তি উন্নয়নকারী, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, আন্তর্জাতিক জমি-বাড়ি সংস্থা, পেশাদার পরামর্শদাতা, এক জানালা শিল্পোন্নয়ন সংস্থা, বেসরকারি পরিষেবা প্রদানকারী ও পরিকাঠামো নির্মাতা, অসরকারি সংগঠনের মতো বিভিন্ন পক্ষকে। এরা সবাই নিজেদের মতো করে নগরোন্নয়নকে প্রভাবিত করতে থাকে। সরকারি পরিকল্পনা সংস্থাগুলি তারপরও ৫ থেকে ১০ বছর মেয়াদের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে যায়। জমি ব্যবহারের এই ধরনের পরিকল্পনা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে আগেই বাতিল হয়ে গেছে। ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডসের মতো দেশে এই প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এর পরিবর্তে শুরু হয় কৌশলগত বহুক্ষেত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, যা বাস্তব উন্নয়নের দিশা নির্দেশে সক্ষম। প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন জমির মালিক ও বেসরকারি ব্যবসায়ীরা। শহরের স্তরে সংযুক্ত জমি ব্যবহার এবং পরিকাঠামোর পরিকল্পনা বৃহৎ আকারে এখানে ধরা পড়েছে, এই ধরনের বহুক্ষেত্রীয় ও আন্তঃবিষয়ক পরিকল্পনায় পরিকল্পককে কৌশলগত পরিকল্পনাকারী থেকে পেশাদার কারিগরি পরিকল্পনাকারী, প্রকল্প পরিকল্পনাকারী থেকে নগর ব্যবস্থাপক এবং দরিদ্রদের প্রতিনিধি—সব ভূমিকাই পালন করতে হয়।

রাজ্য, বাজার এবং নাগরিক সমাজ পরিকল্পক

৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য হল রাজ্যের হাত থেকে নগর পরিকল্পনার ভার, নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিকেন্দ্রায়িত করা। এই আইন সংবিধানের দ্বাদশ তপশিলের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি বিকেন্দ্রীকরণের 'সুপারিশ' করেছে। এই কাজগুলির মধ্যে অন্যতম হল নগর

পরিকল্পনা। বাধ্যতামূলক না হওয়ায় রাজ্য সরকারগুলি ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের আংশিক রূপায়ণ ঘটিয়েছে মাত্র। আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তর প্রায় কিছুই হয়নি। জওহরলাল নেহরু নগর পুনর্নবীকরণ মিশন ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে শহরের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়াস প্রশংসাজনক, কিন্তু অধিকাংশ স্থানীয় কর্তৃপক্ষই মানবসম্পদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। এদের দক্ষতা বাড়াতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের কথা ভাবা হলেও দুর্বল আয়ের উৎস এবং আর্থিক ক্ষমতার হস্তান্তর না হওয়ায় বেসরকারি ক্ষেত্র এতে উৎসাহী হয়নি। যে তিনটি প্রতিবেদনের কথা বলা হয়েছে, সবকটিতেই অবিলম্বে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংস্কার এবং এর দায়িত্ব নির্বাচিত সরকারের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত অর্পণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে দেশে ৭০০০টি স্বীকৃত শহর, ৬২৬টি জেলা এবং ৬ লক্ষ গ্রাম রয়েছে। ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত হলে সরকারের উচ্চ স্তরের পাশাপাশি প্রতিটি স্থানীয় পরিচালক সংস্থায় পরিকল্পনাকারীর প্রয়োজন হত। বর্তমানে এমনকী রাজ্য পরিকল্পনা দপ্তর এবং জাতীয় পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও শিক্ষিত পেশাদার পরিকল্পকের অভাব রয়েছে। দেশে পেশাদার পরিকল্পকদের যারা স্বীকৃতি দেয়, সেই ইনস্টিটিউট অফ টাউন প্ল্যানারস অফ ইণ্ডিয়ান—ITPI-এর ২০১৩ সালে ২৮৯৯ জন সহযোগী সদস্য ছিলেন। মোট পরিকল্পকের সংখ্যা সব মিলিয়ে ৫ হাজার হবে বলে ধরা যায়। অর্থাৎ প্রতি ১ লক্ষ শহরবাসী পিছু পরিকল্পনাকারীর সংখ্যা মাত্র ১.৩২ শতাংশ। উগান্ডা, মালি, তানজানিয়ার মতো আফ্রিকার দরিদ্রতম দেশগুলির সঙ্গে এই পরিসংখ্যান তুলনীয় (ইউএন হ্যাবিটেট ২০১৩)। ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশগুলিতে পরিকল্পনাকারীর সংখ্যা প্রতি লক্ষে ৩৭.৬৩ শতাংশ। (ibid 2013) এদেশে সর্বস্তরেই পরিকল্পকের বিপুল ঘাটতি রয়েছে।

শহর পরিচালনার আর একটি প্রধান বিষয় হল পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণ এবং তার ওপর নজরদারি। পরিচালন ব্যবস্থার এই দিকটির ওপর HPEC-র প্রতিবেদনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এজন্য নগর ব্যবস্থাপনা নিয়ে চারটি জাতীয় স্তরের স্কুল খোলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। নগর ব্যবস্থাপকদের প্রধান কাজ হবে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি, বেসরকারি পরিকাঠামো নির্মাণকারী এবং নাগরিক সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন। 'স্মার্ট শহরগুলিতে' এই ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এক্ষেত্রে বর্তমান শহরগুলির বাস্তব ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে সংযুক্ত করার দায়িত্ব থেকে যায়।

পরিকল্পনাকারীরা যে কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানেই নিযুক্ত হন, এমনটা নয়। বরং উলটে দেখা যায়, বেসরকারি ক্ষেত্রেই এ সংক্রান্ত কাজের চমৎকার পরিবেশ রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলি অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে উঠছে। বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে, পেশাদার পরিকল্পনাকারীরা সরকারি ও বেসরকারি—উভয় পরিসরেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন। বেসরকারি ক্ষেত্রে পরিকল্পকদের চাহিদা বাড়তে থাকায় সমস্যায় পড়েছে স্থানীয় নগর কর্তৃপক্ষগুলি। আর্থিক দৈন্যদশায় ভুগতে থাকা এই পরিচালন সংস্থাগুলির পক্ষে বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে দক্ষ মানবসম্পদ নিজেদের কাছে নিয়ে আসা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। এর থেকে দুটি বিষয় উঠে আসছে। প্রথমত, শিক্ষিত পরিকল্পনাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাকারীর প্রকার। দ্বিতীয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

জমি ব্যবহার ও বাস্তব পরিকল্পনা প্রণয়নের যে প্রথাগত ভূমিকা পরিকল্পকরা পালন করে আসছেন, সময় এসেছে সেই ঘেরাটোপের বাইরে তাঁদের বের করে আনার। জমি ব্যবহার ও পরিকাঠামোগত পরিকল্পনার সংযুক্তিসাধন, দীর্ঘমেয়াদি বৃহৎ পরিকল্পনার বদলে প্রকল্পভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের অর্থনৈতিক ও পরিচালনাগত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতাও তাঁদের কাজের অঙ্গ। আয়ত্তের মধ্যে আবাসন নির্মাণ এখন একইসঙ্গে সরকারি অগ্রাধিকার এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্ভাবনার উৎস। MGI-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এরজন্য পেশাদারি দক্ষতা এবং আর্থিক সম্পদ—দুইয়েরই প্রয়োজন। বিকাশশীল অর্থনীতিতে যে বিপুল অসাম্য ও সীমিত সম্পদের সমস্যা থাকে, তার মোকাবিলায় নাগরিক সংগঠনগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'তৃতীয় ক্ষেত্র' হিসাবে পরিচিত এই সংগঠনগুলি একদিকে আনুষ্ঠানিক শাসনপরিধির বাইরে থাকা প্রান্তিক মানুষজনের স্বার্থরক্ষায় তাদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে, অন্যদিকে তাদের কাছে নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেয়। নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা এবং সরকারি ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে নাগরিক সংগঠনগুলি প্রায়শই যে দুটি হাতিয়ার ব্যবহার করে সেগুলি হল তথ্যের অধিকার আইন এবং জনস্বার্থমূলক আবেদন। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে পরামর্শদাতার ভূমিকা পরিকল্পকদেরই পালন করতে হয়। আমাদের শহরগুলিতে যেরকম অসাম্য রয়েছে, তাতে 'সপ্রতিভ' নগর ভবিষ্যতের জন্য বাজার ও নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণে সর্বাত্মক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা একান্ত আবশ্যক।

ভারতে পরিকল্পনা শিক্ষা

ভারতে নগর পরিকল্পনা শিক্ষার সূচনা পাঁচের দশকের মধ্যভাগে। প্রথমে প্রধানত স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু হয়। পরে ভূগোল, অর্থনীতি ও সমাজবিদ্যার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও এটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বছর পঁচিশেক আগে শুরু হয়েছে Bachelor of Planning বা B-Plan পাঠক্রম। বর্তমানে ১৮টি প্রতিষ্ঠানে Master of Planning এবং ৮টি প্রতিষ্ঠানে B-Plan পড়ানো হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে B-Plan-এর ২০০টি ও ৫০০টি Master of Planning-এর আসন রয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অর্জনের জন্য নগর, পরিবহণ, আবাসন, পরিকাঠামো, পরিবেশের মতো যে কোনও

বিষয় বেছে নেওয়া যায়। বর্তমানে দেশে ৫ হাজার জন প্রশিক্ষিত পরিকল্পক রয়েছেন। ২০৩১ সালে প্রয়োজন হবে ১ লক্ষ ৬০ হাজার জনের। অর্থাৎ আগামী ২০ বছর ধরে প্রতি বছর গড়ে ৮০০০ করে পরিকল্পকের প্রয়োজন।

পরিকল্পনা নিয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি স্তরের আদর্শ পাঠক্রম প্রস্তুত করেছে The Institute of Town Planners of India, বহুমুখী পরিবেশ সম্পর্কে পরিকল্পনার ছাত্র-ছাত্রীদের ওয়াকিবহাল করে তুলতে স্নাতক স্তরের পাঠক্রমে রাখা হয়েছে ৪০টি বিভিন্ন শাখার বিষয়। তবুও এই পাঠক্রমের হাতে কলমের শিক্ষা এখনও প্রধানত বাস্তব পরিকল্পনাকে ঘিরেই কেন্দ্রীভূত। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ভৌগোলিক মাত্রায় জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে শেখানো হয়। তারা সাইট প্ল্যান, জোনাল প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান প্রভৃতি তৈরি করতে শেখে। স্নাতকোত্তর স্তরে বিভিন্ন শাখার ছাত্র-ছাত্রীদেরই প্রবেশাধিকার আছে। দু বছরের পাঠক্রমে পরিকল্পনার কোনও একটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয় পড়ুয়াদের।

পাঠক্রমে তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তবক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের মধ্যে পূর্ণ ভারসাম্য রাখা হয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর—দুটি স্তরেই বিভিন্ন বাস্তব প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার পাঠ্যসূচির মূল শিক্ষার ভিতটি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। এই শিক্ষাক্রমে ভাবী পরিকল্পকদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কিনা, তা ফের খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে হয়।

পরিকল্পনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পঠন-পাঠনই এই পেশায় দক্ষ মানবসম্পদ সরবরাহের একমাত্র পথ কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কারিগরি শিক্ষা এবং পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত পেশাদারদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধারাবাহিক কার্যক্রমও এক্ষেত্রে মানবসম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম। উদাহরণ হিসাবে নরওয়ের কথা বলা যায়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি আমাদের দেশের পলিটেকনিকের ধাঁচে গড়া স্কুলগুলিতে পরিকল্পনা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্কুলগুলি নরওয়েতে Tertiary Vocational School নামে পরিচিত।

সামনের পথ—'সপ্রতিভ' শহরের লক্ষ্যে পরিকল্পনা শিক্ষার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

পরিশেষে ভারতে পরিকল্পনা শিক্ষার দিশানির্দেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার কথা হল :

● শহরের জন্য আরও পরিকল্পক—চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে পরিকল্পকের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রতি বছর যতজন পরিকল্পনা পেশাদার পাশ করে বেরোন, তা চাহিদার তুলনায় অনেক কম। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি হোক বা বেসরকারি, শিক্ষার উচ্চমান সুনিশ্চিত করতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার।

● রাজ্য, বাজার ও নাগরিক সমাজের জন্য পরিকল্পনাকারী—এই ক্ষেত্রগুলিকে পৃথকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে, প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিকল্পকের ভূমিকা কীভাবে পালটে যায়, তা বোঝা প্রয়োজন। পরিকল্পনা শিক্ষাকেও সেই অনুযায়ী বহুমুখী করে তোলা দরকার।

● শহরে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সর্বস্তরে পরিকল্পনাকারীদের শিক্ষিত করে তোলা—৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজের বিকেন্দ্রীকরণ অবশ্যম্ভাবী। ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের যে দক্ষতা প্রয়োজন, তার জোগানের ব্যবস্থা পরিকল্পনা শিক্ষাকে করতে হবে।

● সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে ভারসাম্য—দুই ধরনের পরিকল্পনাকারীই যাতে উপযুক্ত শিক্ষা পান, পরিকল্পনা শিক্ষা ও পাঠক্রমকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনও এক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি।

● শহরের জন্য আরও ব্যবস্থাপক—নগরোন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের বৈচিত্র যত বাড়ছে, ততই দক্ষ ও কার্যকর নগর ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনার পরিচালনগত দিকটি অপরিহার্য হয়ে উঠছে। এজন্য পৃথকভাবে নগর ব্যবস্থাপকের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

● পরিকল্পকদের পরিধির বিস্তার—জমির ব্যবহার, পরিকাঠামো, পরিবেশগত সুস্থিতি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, ঝুঁকি কমানো, অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা, আর্থিক বৈচিত্র—এমন বিভিন্ন বিষয়ের সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে বাস্তবমুখী, দূরদর্শী নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনা শিক্ষাকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলাতে হবে, যা দীর্ঘকালীন মেয়াদে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারেরও সূচনা করবে।

পরিকল্পনা পেশাটির মূল মন্ত্র সমাজের 'সার্বিক উন্নতিবিধান'। কিন্তু উদারীকরণ পরবর্তী যুগে এই 'সার্বিক উন্নতি'-র অর্থ ঠিক কী, তা নিয়ে তাত্ত্বিক মহলে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। তবে যত বিতর্কই থাকুক, পরিকল্পনায় নীতিবোধ ও নৈতিক দায়িত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আগামী বছরগুলিতে এই ক্ষেত্রের পেশাদারদের প্রস্তুত হতে হবে সার্বিক উন্নতিবিধানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। যে 'সপ্রতিভ শহর' গড়ে তোলার স্বপ্ন আমরা দেখি, তা যাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের না হয়ে সকলের জন্য হয়, সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব পরিকল্পনা শিক্ষারই।❑

[লেখক ড. রলি অরণ্য নরওয়ের নরওয়েগিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির বিশ্বায়ন ও নগরোন্নয়ন বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক। চেতন বৈদ্য নতুন দিল্লির স্কুল অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচারের নির্দেশক।]

সরকারি চাকরি পেতে ..... অপরিহার্য্য

||KAUTILYA||

CIVIL SERVICE ACADEMY

4, 3rd ByeLane Subhas Nagar, DumDum Cantonment, Kolkata - 700065

Mob. No. : 9836336298 / 9051987199 (9 p.m. to 11 p.m.) Everyday

এখানে **WBCS (Exe) & etc., Audit & Accounts Service, SSC-Section Officer, Tax Assistant, Bank, Rail, School Service, PSC-IDO, KPS, Clerkship, Miscellaneous, Special Clerk, PSC Group-D, Primary School** প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত করে তোলা হয়।

একমাত্র আমিই বলি .....

(a) মাত্র ৩ মাস **Class** করে **WBCS-**এর **Prelims** পাওয়া যায়। পাচ্ছে প্রত্যেকেই এখান থেকে প্রতি বছর অর্থাৎ, **2004** থেকে **100%** ছাত্র **Prelims** পাচ্ছে। **(b)** সরকারী চাকরীর দুনিয়ায় মেধাবী ছাত্র বলে কোনো কথা হয় না। **P-Division** এর ছাত্রও পরিশ্রম করলে **1st Class** ছাত্রের পূর্বে চাকরি পাবে। আর **1st Class** গুলো একটু খাটলে একটা কেন এক বছরে অনেকগুলি চাকরি পাবে। **(c) 1st attempt-**এ **Prelims, Main & Personality Test** পার হয়ে চাকরি পাওয়া যায়। পাচ্ছে প্রত্যেক বছর একমাত্র **KAUTILYA** থেকেই।

কেন পায় আমার ছাত্ররা এত অল্প সময়ে?

(a) আমি প্রত্যেক ছাত্রের কোথায় দুর্বলতা রয়েছে তা দ্রুত বুঝতে পেরে তাকে **Alert** করি, **Extra** সময় দিই। তাদেরকে **Subjectwise** বিভিন্ন **Expert** দিয়ে **Develop** করাই।
(b) বার-বার **Revision** দিইয়ে **Group Discussion-**এর মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্রকে **Target** করে যোগ্য করে তোলা হয়। যারা **Math** দেখলে ভয় পায়, তারাও আমার কাছে পড়ে দ্রুত চটজলদি অঙ্কে **Expert** হয়ে ওঠে। **SSC Graduate Level, Section Officer** এবং **Bank-**এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।
(c) Descriptive Way-তে **GK** পড়াই, **Short-Cut** পদ্ধতি **GK-**তে চলে না। তাই **Prelims-**এর সঙ্গে-সঙ্গে **Main-**এর ও **Preparation** চলতে থাকে।

আমার ছাত্রদের খুবই কম পড়তে হয় কারণ

আমি **Topics** গুলো মনোগ্রাহী করে বিস্তারিতভাবে মগজস্থ করিয়ে দিই — বার-বার মুখে-মুখে সকলকে নিয়ে আলোচনা করি। শুধু একগাদা-গুচ্ছের **Notes** দিয়ে দায় সারি না।
বড় বড় **Coaching Centre** গুলো যেটা করে থাকে — ছাত্ররা **Back-dated** নোটস্ এর বস্তা বাড়ি নিয়ে এসে হাহুতাশ করে **3-4 Attempt** এ ও **Prelims** পায় না — অবশেষে প্রাইভেট চাকরিতে **Join** করতে বাধ্য হয় — আর জীবনভর ওদের গালি দেয়। হ্যাঁ, এটা সত্য কথা, একদম বাস্তব সত্য কথা। কারণ প্রতিবছর এরকম ঠকে আসা ছাত্র প্রচুর সংখ্যায় আমার কাছে এসে তবে উদ্ধার হয় .....
এটা আমার অহংকার নয়। ঐ সব ছাত্রদের দুঃখের কথা আর ঐ সব ব্যবসায়ী **Centre** গুলোর অসহায়তার কথা। কারণ **"Master** কিনে ব্যবসা হয়, ছাত্রদের চাকরির নিয়োগ পত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে — প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যায় না।" ওরা খবরের কাগজে ভুয়ো ছবি দেখায়। আর আমার কাছে আসলে গোটা **Successful** চাকরি পাওয়া আমার ছাত্রদেরকেই তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, তাদের **experience share** করাতে সহযোগিতা করি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যারা **2014** এর **WBCS-Prelims** পরীক্ষা **03.08.14** তে দিয়েছেন, সাফল্য পত্রিকার **Solution** হতে নিশ্চিত হোন **(Gen-121, OBC -119, SC-101, ST-81)** পাচ্ছেন কিনা — পেলে **2014** এর **Mains** (সম্ভবত নভেম্বর) পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন আর অপেক্ষা না করে **KAUTILYA**তে। অন্যরা **September** এর দ্বিতীয় শনিবার থেকে নতুনভাবে **WBCS-2015**র **Prelims, Main-**এর জন্য আসুন। **2015** এর বিজ্ঞপ্তি খুব শীগ্রই বেরোবে। **Prelims** হবে **2015** এর জানুয়ারিতেই এবং মেনস হবে জুন-জুলাইয়ের মধ্যে। প্রস্তুতি নিতে দেরি করবেন না। আপনি সফল হবেন-ই, এটা আমার অঙ্গীকার। *Executive Director - সোমা ঘোষ।*

Mob. No. : 9836336298 / 9051987199 (9 p.m. to 11 p.m.) Everyday
No Admission Charges, Only MONTHLY FEES System.

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(১৭ জুলাই—২১ আগস্ট, ২০১৪)

বহির্বিশ্ব

● **চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দুর্নীতি বিরোধী অভিযান :**

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দুর্নীতি বিরোধী অভিযান এই মুহূর্তে নতুন মোড় নিয়েছে। অতি সম্প্রতি, দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা 'পলিটব্যুরো'-র স্থায়ী সদস্য এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌ ইয়োং ঘাং-এর বিরুদ্ধে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযানে এত বড় মাপের নেতার বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ এই প্রথম। চৌ ইয়োং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগও গুরুতর। বলা হচ্ছে, কয়েকশো কোটি ডলার সম্পত্তির মালিক তিনি ও তাঁর পরিবার দেশের তৈল সম্পদের ওপর একচেটিয়া দখল কায়েম করেছেন।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক শি চিনফিং মনে করেন, যদি এখনই দ্রুতবর্ধমান দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের প্রবণতা কঠোর হাতে দমন করা না যায়, তাহলে কমিউনিস্ট পার্টিই ভবিষ্যতে অবান্তর ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পর্যবেক্ষকমহলের মতে, শি চিনফিং-এর দুর্নীতি রোধের প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু দুর্নীতির উৎসে যাওয়ার চেষ্টা তিনি করেননি। সরকারি ক্ষেত্রে দুর্নীতির মতো যথেচ্ছাচার তখনই সম্ভব হয়, যখন গণ-নজরদারির বন্দোবস্ত না থাকে। চীনে প্রথম থেকে যে একদলীয় শাসন কায়েম, তা সেই নজরদারির সুযোগ দেয় না।

● **মার্কিন জেনারেল হত্যা পরবর্তী আফগান পরিস্থিতি :**

রাজধানী কাবুলের অদূরে ব্রিটিশ পরিচালিত এক সেনা অ্যাকাডেমিতে গত ৫ আগস্ট আচমকা হামলায় মার্কিন মেজর জেনারেল হেরল্ড গ্রিনি নিহত হওয়ার ঘটনায়, যথেষ্ট চাপে পড়ে গেছেন আফগান সেনা। কারণ হামলাকারী হিসাবে এক আফগান সেনাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে আফগান সেনা ও বিদেশি সেনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। আফগান সেনা প্রশিক্ষণে ওয়াশিংটন কতটা কী সক্রিয় হবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলতি বছরের শেষে আফগানিস্তান থেকে আন্তর্জাতিক বাহিনীর প্রত্যাহার সংক্রান্ত প্রস্তুতি তদারককারী কমান্ডের ডেপুটি কমান্ডিং জেনারেলের দায়িত্ব পালন করছিলেন নিহত সেনাকর্তা গ্রিনি। আরও উল্লেখযোগ্য হল, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর এই প্রথম বিদেশের মাটিতে মার্কিন সেনাবাহিনীর জেনারেল পদের কেউ নিহত হলেন।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, হামলাকারী আফগান সেনাকেও হত্যা করা হয়েছে।

● **ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি নিষিদ্ধ মিশরে :**

স্বৈরাচারিতার নতুন নজির সৃষ্টি করে মিশরের সেনা সরকার মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক শাখা ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। দেশের উচ্চ প্রশাসনিক আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং এক আদেশ জারি করে সেনা সরকার সংগঠনের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্তও করে। অর্থাৎ বিরোধিতার সমস্ত সম্ভাবনা মুছে দিতে সেনা সরকার বদ্ধপরিকর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের অক্টোবরে মুসলিম ব্রাদারহুড-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরে সেনা কর্তৃপক্ষ একে 'সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে'র তালিকা ভুক্ত করে। মিশরের ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুর্শিকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর সেনাবাহিনীর একের পর এক পদক্ষেপ দেশটিকে কার্যত ঘোরতর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে আন্তর্জাতিকমহল মনে করে।

● **ইবোলা সংক্রমণে বিপর্যস্ত আফ্রিকার একাধিক দেশ :**

লাইবেরিয়ায় শুরু, তারপর শিয়েরা লিওন, নাইজেরিয়া। ইবোলা সংক্রমণের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ে একের পর এক আফ্রিকান দেশে। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাইবেরিয়া ও নাইজেরিয়ায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সমগ্র দুনিয়া জুড়ে সতর্কতা জারি করেছে। কয়েক লক্ষ মার্কিন ডলার মঞ্জুর করা হয়েছে এই মারণরোগের প্রকোপ ঠেকাতে। এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৯৬১।

● **চীনে ভয়াবহ ভূ-কম্পে ক্ষতিগ্রস্ত দশ লক্ষ মানুষ :**

৩ আগস্ট দক্ষিণ চীনের ইউনামপ্রদেশে বিধ্বংসী ভূমিকম্পে প্রায় ৪০০ মানুষ নিহত হলেন। আহত দু'হাজার। রিখটার স্কেলে ভূ-কম্পের মাত্রা ছিল ৬.১। ক্ষতিগ্রস্ত ১০ লক্ষ। ইউনান প্রশাসন জানিয়েছে, ৮০ হাজার বাড়ি ধুলোয় মিশে গেছে। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার বাড়ি। ইউনানপ্রদেশে গত ১৪ বছরের মধ্যে এমন ভূমিকম্প হয়নি।

চীনের ভূমিকম্পবিষয়ক প্রশাসনের মতে, ইউনানপ্রদেশের লুদিয়ানা-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল বরাবরই ভূকম্পপ্রবণ। কৃষি ও খনির কাজ এখানকার বাসিন্দাদের প্রধান অবলম্বন। ১৯৭০ সালে এই ইউনানপ্রদেশে ৭.৭ মাত্রায় ভূমিকম্পে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।

● **ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাষ্ট্রপতি উইডোডো :**

ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন জোকো উইডোডো। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন জেনারেল ও রাষ্ট্রপ্রধান সুহার্তো-র জামাতা প্রবোয়ো সুবিয়ান্তো-কে পর্যুদস্ত করেন। সুবিয়ান্তো নিজেও অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল। রাজধানী জাকার্তার অভিজাত সমাজের প্রতিনিধি। তুলনায় উইডোডো নিতান্তই সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে এসেছেন। ইন্দোনেশিয়ার ৭০ বছরের ইতিহাসে এমন কেউ রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হননি। অমলিন, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, জনদরদ ও সংস্কারপ্রিয়তার জন্য এই রাজনীতিক দেশবাসীর মন জয় করে

নিয়েছেন। একের পর এক সাময়িক জেনারেল বা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের রাষ্ট্রপতি দেখতে দেখতে ক্লান্ত দেশবাসী 'নিজেদের লোক'-কে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মারফত কর্ণধার বেছে নিয়েছেন।

● **তুরস্কের শাসনভার এর্দোগানের হাতে :**

জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির নেতা রিসেপ তায়েব এর্দোগান তুরস্কের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। তিনি মোট বৈধ ভোটের ৫২ শতাংশ পাওয়ায় দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের প্রয়োজন হয়নি (বিশ্বের বহু দেশের মতোই তুরস্কেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনও প্রার্থী ৫০ শতাংশ ভোট না পেলে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রথম দুই প্রার্থীর মধ্যে ফের নির্বাচন হয়)। এর্দোগানের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একমেলেদ্দিন ইহসানোগুল পান ৩৮.৩৩ শতাংশ ভোট। অন্য আর এক প্রার্থী কুর্দিপ পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী সেলাহাত্তিন নেমিরতাস পান ৯.৭১ শতাংশ ভোট। প্রসঙ্গত এর্দোগান দীর্ঘ ১৩ বছর তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এবার রাষ্ট্রপতি হলেন। আর এই প্রথম সরাসরি ভোটের মাধ্যমে তুরস্কে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হল।

● **ইরাকে ফের মার্কিন বিমান হানা :**

উত্তর ইরাকে মার্কিন নাগরিক এবং মার্কিন তেল সংস্থাগুলিকে ইসলামিক স্টেট বা আইএস জঙ্গি আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে গত ৮ আগস্ট ইরাকে ফের মার্কিন বোমারু বিমান হানা শুরু করল ওবামা প্রশাসন। ২০০১ সালে ইরাকের অভিযানের লক্ষ্য ছিল 'গণবিধ্বংসী অস্ত্র' (পরে অবশ্য তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়)।

এবারের হানাদারি শুরু করার পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা জানান, ইরাকে ইসলামিক রাষ্ট্রবাদীদের সামরিক শক্তি দুর্বল করা। ওবামা বলেন, এই রাষ্ট্রবাদীরা আসলে সাবেক আল কায়দায় বিভিন্ন উপগোষ্ঠী, যারা আবু বকর আল বাগদাদির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিরিয়া এবং ইরাক জুড়ে একটি খলিফাতন্ত্র গড়তে চায়। এই কারণেই আক্রমণ। উল্লেখ্য, ইরাকের নির্বাচিত সরকারও মার্কিন সামরিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছিল।

● **ইরাকে প্রধানমন্ত্রী বদল :**

টানা আট বছর প্রধানমন্ত্রী থাকার পর নুরি আল-মালিকি কার্যত অপসারিত হলেন। ১১ আগস্ট আচমকা এক ঘোষণায় ইরাকের রাষ্ট্রপতি ফুয়াদ মাসুম জানিয়ে দেন, জাতীয় সংসদের বর্তমান উপাধ্যক্ষ হায়দর আল-আবাদি দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে মালিকির স্থলাভিষিক্ত হলেন। ঘোষণাটা আচমকা হলেও প্রত্যাশিতই ছিল। কারণ মার্কিন চাপ। সংঘর্ষদীর্ণ ইরাকে আল-মালিকিকে ক্ষমতায় রেখে সে দেশের একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত রাজনীতিতে স্থায়িত্ব আনা যে সম্ভব নয়, এটাই ইরাকে স্বঘোষিত শাসক মার্কিন প্রশাসন মনে করে। তাই প্রধানমন্ত্রী বদল।

● **শান্তি বৈঠকে ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন :**

প্যালেস্তাইনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ব্যাপক হত্যা এবং ধ্বংস চালানোর পর অবশেষে আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি হল ইজরায়েল। মিশরের মধ্যস্থতায় পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে যুযুধান দুপক্ষ কয়েক দফায় অস্ত্র বিরতি পালন করল। কিন্তু তারই মধ্যে ইজরায়েল প্রশাসনের হিংস্র অভিব্যক্তি আশঙ্কা জাগিয়ে রেখেছে।

● **বিপন্ন চীনের প্রাচীর :**

সংবাদে প্রকাশ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে চীনের প্রাচীর। বহু শতাব্দী আগে মিং রাজাদের আমলে তৈরি এই প্রাচীরের এক-তৃতীয়াংশই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জীর্ণ প্রায়। মাত্র ১০ শতাংশ এলাকায় কিছুটা সংরক্ষণ হয়েছে। চীন জুড়ে আশঙ্কা, বিশ্বের প্রাচীনতম বিস্ময় কি ভেঙে পড়বে? এদিকে প্রাচীর রক্ষায় চীনা প্রশাসন একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করেছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় লাগাম ছাড়া শিল্পায়ন এবং অতিরিক্ত ঘনবসতিই চীনের প্রাচীরকে বিপন্ন করে তুলেছে।

এই দেশ

● **বিচারপতি নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ :**

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (UPA) সরকারের জমানায় বিচারপতি নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ আনলেন সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রাক্তন বিচারপতি ও বর্তমানে 'প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'-র চেয়ারম্যান মার্কন্ডেয় কাটজু। তাঁর অভিযোগ, মাদ্রাজ হাইকোর্টের এক অতিরিক্ত বিচারপতির বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ সেটা না করলে UPA সরকারের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল দক্ষিণের এক শরিক দল। ফলে সরকার বাঁচাতে ওই বিচারপতির মেয়াদ একাধিকবার বাড়াতে বাধ্য হয় বিদায়ী কংগ্রেস জোট সরকার।

মার্কন্ডেয় কাটজু-র বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তুমুল বিতর্ক চলে। পাশাপাশি প্রশ্ন ওঠে, ২০০৪ সালের ঘটনা নিয়ে অভিযোগ জানাতে কাটজু ১০ বছর সময় নিলেন কেন?

● **কাশ্মীরে এনসি-কংগ্রেস জোট ছিন্ন :**

জম্মু-কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্স (NC) ও কংগ্রেস জোট ভেঙে গেল। লোকসভা নির্বাচনের পর জোটের এই ভাঙন প্রত্যাশিত ছিল। তার মানে আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে সম্ভাব্য বিধানসভা নির্বাচনে ওই দুই দলের জোট হচ্ছে না। এখন প্রস্তুত নতুন জোট গঠনের প্রেক্ষাপট। যে প্রেক্ষাপটে রয়েছে এবারের ভোটে কাশ্মীর উপত্যকার তিনটি লোকসভা আসনেই বিপুল ভোটে জয়ী পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (PDP)। অন্যদিকে রয়েছে বিজেপি, যারা জম্মু ও লাদাখে চমকপ্রদ সাফল্য পেয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে যে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কংগ্রেস-কনফারেন্স ভাঙন তারই অনিবার্য প্রতিফলন।

● **ভারত-নেপাল মৈত্রী :**

দীর্ঘ ২৩ বছরের ব্যবধানে গত ২৬ জুলাই ভারত-নেপাল যৌথ কমিশনের বৈঠক হল। বৈঠকে প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, ব্যবসা, লগ্নি, জলসম্পদ ও সীমান্ত বিষয়ে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা

স্বরাজ ও নেপালের বিদেশমন্ত্রী মহেন্দ্র বাহাদুর পান্ডে। এছাড়াও ছিলেন বিদেশসচিব সুজাতা সিং ও অন্য কর্তারা।

● **ডব্লিউটিও চুক্তি থেকে সরে এল ভারত :**

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-র খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সায় দিল না ভারত। ৩১ জুলাই ছিল ওই চুক্তিতে সই করার শেষ দিন। জেনিভায় আয়োজিত ১৬০টি রাষ্ট্রের বৈঠকে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি অঞ্জলি প্রসাদ জানান, গণবণ্টনের জন্য শস্য মজুত করা ও সেই লক্ষ্যে দেওয়া খাদ্যে ভরতুকি নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের নতুন জমানায় স্থায়ী সমাধানসূত্র না মেলা পর্যন্ত ভারত ওই চুক্তিতে সই করবে না। ভারত চায়, এই অবাধ বাণিজ্য চুক্তিতে সই করার সময়সীমা এ বছরের শেষপর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হোক। আর তার মধ্যেই খাদ্য সুরক্ষার প্রশ্নে স্থায়ী সমাধানসূত্র বার করুক ডব্লিউটিও সদস্যরা।

সংবাদে প্রকাশ, ভারতের এই সিদ্ধান্তের জেরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির ভাষায়, ভারতের এই সিদ্ধান্ত হতাশজনক। এর ফলে সংকটে পড়বে ডব্লিউটিও। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হলেও জেনিভার বৈঠকে ভারতকে সমর্থন করে কিউবা, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া।

● **অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচার আইনে সংশোধন :**

অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচার (জুভেনাইল জাস্টিস) আইন সংশোধনী বিধেয়ক (বিল) সংসদে গৃহীত হল। নতুন আইন অনুসারে, ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে, এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক যদি খুন, ধর্ষণ, কিংবা অন্য কোনও নৃশংস ও অমানবিক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে 'জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে'-র অনুমোদন সাপেক্ষে তার বিচার সাধারণ ফৌজদারি আদালতেই হবে। এবং দেশের সাধারণ আইনের ভিত্তিতেই বিচার করা হবে। এত দিন পর্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্কের (১৮ বছর পর্যন্ত) সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল তিন বছরের কারাবাস (সংশোধনাগারে বসবাস) এবং তারপর নিঃশর্ত মুক্তি। প্রসঙ্গত, ২০১২-র ডিসেম্বরে দিল্লির রাজপথে এক তরুণী ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর জুভেনাইল জাস্টিস আইন বদলের (সংশোধনের) দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। কারণ ওই নারকীয় ঘটনায় দোষী সাব্যস্তদের মধ্যে একজন 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' রয়েছে।

● **ফুলন দেবী হত্যা মামলার রায় :**

একদা চম্বল-দস্যুদের নেত্রী, পরে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ফুলন দেবী খুন হয়েছিলেন ২০০১ সালের ২৫ জুলাই। দীর্ঘ ১৩ বছর পর সেই হত্যা মামলার রায় প্রকাশ হল। দিল্লির এক আদালত ওই খুনের ঘটনায় জনৈক শের সিং রানা-কে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে, উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ওই মামলায় অভিযুক্ত ১০ জনকে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হল। স্মরণ করা যেতে পারে, দস্যুনেত্রী ১৯৮৩ সালে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১৯৯৬ সালে মুলায়ম সিং যাদবের হাত ধরে রাজনীতির আঙিনায় পা রাখেন। উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর লোকসভা কেন্দ্রে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী হিসাবে জয়ী হন।

● **বিচারপতি নিয়োগ কমিশন বিল গৃহীত সংসদে :**

সুপ্রিমকোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সংসদে গৃহীত হল 'জাতীয় বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন বিল'। এক্ষেত্রে প্রায় দু'দশক ধরে চালু ছিল 'কলেজিয়াম' ব্যবস্থা। এতদিন এই 'কলেজিয়াম' বিচারপতি নিয়োগ করত। নতুন বিল গৃহীত হওয়ায় এবার থেকে এই নিয়োগের দায়িত্বে থাকবে একটি কমিশন। দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৬ জনকে নিয়ে এই কমিশন গঠন করা হচ্ছে। কমিশনের বাকি সদস্যরা হলেন, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, শীর্ষ আদালতের দুই বরিষ্ঠ বিচারপতি এবং দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি। তবে উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগ বা বদলির ব্যাপারে কমিশনকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের মতামত নিতে হবে।

● **লোকসভার নতুন উপাধ্যক্ষ :**

তামিলনাড়ুর শাসক দল সর্বভারতীয় আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্তা কাজাগমের (এআইএডিএমকে) নেতা এম থাম্বিদুরাই ষোড়শ লোকসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন। ৬৭ বছরের এই নেতার নাম প্রস্তাব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। সমর্থন করেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। তারপরেই ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় প্রস্তাবটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, থাম্বিদুরাই দেশের সংসদীয় ইতিহাসে প্রথম রাজনীতিক, যিনি এই নিয়ে দুবার লোকসভার উপাধ্যক্ষ হলেন। এর আগে ১৯৮৫-১৯৮৯ রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের আমলে থাম্বিদুরাই উপাধ্যক্ষ হন।

● **এসএসবি-র নতুন ডিজি :**

সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) নতুন ডিরেক্টর জেনারেল হলেন বংশীধর শর্মা। পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের এই আইপিএস অফিসার এতদিন বিএসএফ-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল পদে ছিলেন। নেপাল-ভুটান সীমান্ত প্রহরার দায়িত্বপ্রাপ্ত সশস্ত্র সীমা বল-এর ডিরেক্টর জেনারেলের পদটি তিন মাস শূন্য ছিল। মন্ত্রিসভার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি বংশীধরকেই ওই পদে বেছে নেয়। বংশীধর ২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত এসএসবি-র শীর্ষপদে থাকবেন।

● **যোজনা কমিশন বাতিল :**

৬৭তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের যোজনা কমিশনের (Planning Commission) অবলুপ্তি ঘোষণা করলেন। তিনি জানান, যোজনা কমিশনের পরিবর্তে যত দ্রুত সম্ভব তৈরি করা হবে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। অর্থ বরাদ্দ আর উন্নয়ন প্রকল্পের নকশা তৈরি যার কাজ হবে না। কাজ হবে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার জোগান দেওয়া।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৫০ সালে যোজনা কমিশন গঠন করা হয়। সরকারি নির্দেশ জারি করে এটি গঠন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। এর আগে পরাধীন ভারতেই ১৯৪৪ সালে পরিকল্পনা বোর্ড তৈরি করে ব্রিটিশরা। ১৯৪৬ পর্যন্ত তিনটি পরিকল্পনা তৈরি হয়। তারও আগে ১৯৩৮ সালে আর্থিক পরিকল্পনার কথা প্রথম ভাবেন সুভাষচন্দ্র বসু। যার খসড়া তৈরি করেন বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহা।

১৯৫১ সালে ঘোষিত হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ২০১২ সালে শেষ হয় একাদশ তথা আপাতত শেষ পরিকল্পনার মেয়াদ।

● **নতুন ভোটযন্ত্র :**

ভোটের গোপনীয়তা আরও কঠোর করতে নতুন ভোটযন্ত্র আনার প্রস্তাব দিল নির্বাচন কমিশন। এই মর্মে একটি লিখিত বয়ান পাঠানো হল কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের কাছে। কমিশনের যুক্তি, একটি বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের আয়ু ১৫ বছর। সেই হিসাবে ২০০০-২০০১ সালে যে প্রায় দেড় লক্ষ যন্ত্র কেনা হয়েছিল, ২০১৫-১৬ সালেই তা বদলানো প্রয়োজন। এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের অপেক্ষা।

এই রাজ্য

● **'এনসেফেলাইটিস' প্রতিরোধে নতুন জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি :**

'এনসেফেলাইটিস' সংক্রমণ রাজ্যে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রীতিমতো মহামারির রূপ ধারণ করেছিল। ভবিষ্যতে এমন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়াতে রাজ্য সরকার কয়েকটি নতুন 'জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি' ঘোষণা করেছে। ☐ স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরত জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক-আধিকারিকের সন্ধান। ☐ ব্লক মেডিক্যাল অফিসারদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। ☐ ইনস্টিটিউট অফ হেল্‌থ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের জনস্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণা বাড়ানো। ☐ মেডিক্যাল কলেজের কমিউনিটি মেডিশিন বিভাগকে নিজ নিজ জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে যুক্ত করা। ☐ রাজ্যের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য আরও দ্রুত বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের রূপরেখা তৈরি করা। ☐ স্টেট ব্যুরো অফ হেল্‌থ ইনটেলিজেন্সকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করা। ☐ জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচি আরও ব্যাপক আকারে প্রণয়ন করা। নতুন টিকা অন্তর্ভুক্ত করা।

● **বিদ্যুৎ প্রকল্পের স্বীকৃতি :**

রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার পুরুলিয়া জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (পুরুলিয়া পাম্পড স্টোরেজ) বিদ্যুৎ শিল্পে একটি 'ব্যতিক্রমী পরিকল্পনা'-র স্বীকৃতি পেল। ওই প্রকল্পটিকে সামনে রেখে ইন্ডিপেট পাওয়ার প্রডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গকে বিদ্যুৎ শিল্পে অগ্রগণ্য রাজ্য হিসাবে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছে বলে বণ্টন সংস্থা জানিয়েছে।

● **'ইউনেস্কো'-র নির্দেশে ফের দার্জিলিং-এ টয় ট্রেন :**

টয় ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং সফর এখন অতীত। প্রথমে ধস পরে ভূমিকম্পের আঘাতে জায়গায় জায়গায় রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত (কোথাও লাইন ঘুরে গেছে, কোথাও মাটির নীচে ঢুকে গেছে) হওয়ায় ২০১০ থেকে 'স্বপ্নের সেই সফর' ব্যাহত। বর্তমানে ৮৮ কিলোমিটার ওই রেলপথে দু'ভাগে খুব অল্প দূরত্বের মধ্যে টয় ট্রেন চলে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা 'ইউনেস্কো' ফের পুরো পথে টয় ট্রেন চালু করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রসঙ্গত, দার্জিলিং-এর এই টয় ট্রেন-কে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'-এর স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। এখন ইউনেস্কো-র বক্তব্য, যত দ্রুত সম্ভব টয় ট্রেন পরিষেবা আগের জায়গায় ফিরিয়ে না আনলে 'হেরিটেজ' মর্যাদা বাতিল করে দেওয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে নড়েচড়ে বসেছে ভারতীয় রেল।

● **'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের বর্ষপূর্তি :**

রাজ্য সরকারের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের এক বছর পূর্ণ হল। গত ১৪ আগস্ট এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে ওই দিনটিকে 'কন্যাশ্রী দিবস' বলে ঘোষণা করা হয়। রাজ্যের সমাজকল্যাণ দপ্তর সূত্রে প্রকাশ, প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত 'কন্যাশ্রী'-র আওতায় প্রায় ১৬ লক্ষ মেয়েকে নিয়ে আসা হয়েছে। দেশের যেকোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রকল্পের সাফল্যের নিরিখে এই সংখ্যাটা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে রাজ্য সরকার 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্প অনুযায়ী, বার্ষিক এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার নীচে আয়, এমন পরিবারের ১৩ থেকে ১৮ বছরের মেয়েদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বছরে ৫০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। পড়াশোনা চালিয়ে গেলে ১৮ বছরের পরে তাঁরা পাচ্ছেন এককালীন ২৫ হাজার টাকা।

● **মুখ্যমন্ত্রী প্রথম বিদেশ সফর :**

২০১১ সালের ২০ মে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম বিদেশ সফরে সিঙ্গাপুর গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র-সহ ৫২ জন বণিক কর্তা ও ১২ জন সরকারি আধিকারিক মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হন। মোট পাঁচ দিনের সফরে (১৮-২২ আগস্ট) একদিন শিল্প সম্মেলনে মিলিত হন। এরপর তিনি সে দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী এবং বণিকসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

● **রাজ্যে দুই বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন :**

বসিরহাট দক্ষিণ এবং চৌরঙ্গি, এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে ভোট নেওয়া হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক মলয় মুখোপাধ্যায়ের (সিপিআইএম) মৃত্যু এবং চৌরঙ্গির তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক শিখা মিত্রের পদত্যাগের কারণে ওই আসন দুটি শূন্য হয়। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। বসিরহাট দক্ষিণে প্রার্থী হয়েছে ফুটবল তারকা দীপেন্দু বিশ্বাস। আর চৌরঙ্গি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী একদা অভিনেত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়।

অর্থনীতি

● **মুম্বইয়ে সিঙ্গাপুর এক্সচেঞ্জ দপ্তর :**

মুম্বইয়ে দপ্তর খুলল সিঙ্গাপুর স্টক এক্সচেঞ্জ (SGX)। ভারতীয় সংস্থার নথিভুক্তি বাড়াতেই এ দেশে পা রাখল তারা। পাশাপাশি, ভারতের বাজারে মূলধনের জোগান বাড়ানোও তাদের লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সংস্থাগুলিকে আরও বেশি করে বিদেশ থেকে তহবিল সংগ্রহের সুযোগ করে দেওয়ার কারণেই 'এসজিএক্স' এ দেশে দপ্তর খুলেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর। সংস্থার মতে, এই দপ্তর মারফত ভারতীয় সংস্থাগুলি সহজেই সিঙ্গাপুরের বাজার থেকে টাকা তোলার সুবিধা পাবে।

● **পরিকাঠামোয় উৎপাদন বৃদ্ধি :**

আটটি পরিকাঠামো শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির হার এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে ছুঁল ৭.৩৫ শতাংশ। মূলত কয়লা, অশোধিত তেল, সিমেন্ট ও বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির হাত ধরেই পরিকাঠামো শিল্প

ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক প্রকাশিত পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে।

● **'ফুড প্যান্ডা' এবার কলকাতায় :**

নেট বাজারে কেনাকাটার পাশাপাশি অনলাইনে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খাবার দেওয়ার চলও। তাই ভারতে তুলনামূলকভাবে নতুন এই বাজার ধরতে ঝাঁপাচ্ছে দেশি-বিদেশি লগ্নিকারীরা। আর এই পথে হেঁটেই দেশের অন্যতম বৃহৎ অনলাইন খাবার ফরমায়েশ করার সংস্থা 'ফুড প্যান্ডা' এবার কলকাতার বাজারেও পরিষেবা দিতে শুরু করল।

● **খরচ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন :**

খাদ্য, সার ও তেলের ওপর ভরতুকির বোঝা কমানোর দিশা দেখাতে এবং আর্থিক ঘাটতিতে রাশ টানতে 'এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট' (খরচ নিয়ন্ত্রণ কমিশন) গঠন করল কেন্দ্রীয় সরকার। এই কমিশনের প্রধান পদে নিযুক্ত হলেন রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর বিমল জালান। এছাড়াও প্রাক্তন অর্থসচিব সুমিত বসু ও শীর্ষ ব্যাংকের প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর সুবীর শোকর্ণ কমিশনের সদস্য হয়েছেন। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের বাজেট প্রস্তাব পেশের আগেই অন্তর্বর্তী রিপোর্ট এবং ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের বাজেটের আগে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে কমিশনকে।

● **ঋণ মঞ্জুরে বিশেষ কেন্দ্র :**

খুচরো ঋণ দ্রুত মঞ্জুরের জন্য বিশেষ কেন্দ্র চালুর পরিকল্পনা ঘোষণা করল ভারতীয় ইউনাইটেড ব্যাংক (UBI)। কলকাতায় ব্যাংকের সদর দপ্তরে এই কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গৃহঋণ ছাড়াও সম্পত্তি বন্ধক রেখে যে ঋণ দেওয়া হয়, সেগুলিই ওই কেন্দ্র থেকে প্রক্রিয়াকরণ হবে। আবেদনপত্র জমার ৬ দিনের মধ্যেই ঋণ মঞ্জুর করাই ব্যাংকের লক্ষ্য।

● **রিল্যায়েন্স-কে জরিমানা :**

শেয়ার বাজারের নিয়ম মেনে সম্পূর্ণ আর্থিক তথ্য না দেখানোয় মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন রিলায়েন্স ইন্ডস্ট্রিজ-কে ১৩ কোটি টাকা জরিমানা করল শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'সেবি' (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া)।

● **দুবাইয়ে আবাসন ক্ষেত্রে বিনিয়োগে ভারত শীর্ষে :**

দুবাইয়ের আবাসন ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের তালিকায় ভারতীয়রা শীর্ষ স্থান দখল করেছে। দুবাই ভূমি দপ্তর প্রকাশিত এক রিপোর্টে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে দুবাইয়ের ৪,৪১৭টি আবাসনে ভারতীয় লগ্নিকারীরা প্রায় ৩০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে।

● **রাজস্থান ব্লকে প্রাকৃতিক গ্যাস :**

রাজস্থান ব্লকে ১ থেকে ৩ লক্ষ কোটি ঘন ফিট (feet) প্রাকৃতিক গ্যাসের সঞ্চয়ভাণ্ডার থাকার কথা জানাল কেয়ার্ন ইন্ডিয়া। সংস্থার দাবি, এর মধ্যে অর্ধেকই উত্তোলন করা যাবে। এই গ্যাস মূলত সঞ্চিত আছে রাগেশ্বরী দ্বীপ গ্যাস ক্ষেত্রে। এর আগে রাজস্থানে ৩৬টি তেল ক্ষেত্রের খোঁজ পায় সংস্থা, যার মধ্যে আছে বৃহত্তম মঙ্গলা তেল ক্ষেত্র।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **'এইডস' নির্মূল করার প্রতিষেধক আবিষ্কারের দাবি :**

মানবকোষে লুকিয়ে বাসা বেঁধে থাকা এইচআইভি-১ ভাইরাসকে জিনোম থেকে আলাদা করার পথের সন্ধান মিলল। ঠিক কম্পিউটার থেকে ফাইল ওড়ানোর মতোই। সদ্য প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে এমন দাবি করলেন লন্ডনের টেম্পল ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের একদল বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যার নাম 'CRIS/CAAS-9' জিনোম এডিটিং সিস্টেম। নতুন এই আবিষ্কার বাস্তবায়িত হলে দীর্ঘ দিন ধরে চলা 'এইডস' গবেষণায় যুগান্তকারী সাফল্য আসবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। হাসি ফুটবে বিশ্বের প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ HIV আক্রান্তের মুখে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস' মানবকোষে একবার ঢুকে পড়তে পারলে আর বেরোয় না। ঘাঁটি গেড়ে বসে। আক্রান্তের DNA-তে ঢুকিয়ে দেয় এর মারণ জিনোম। ফলে বাকি জীবনটা ওষুধ আর হাজারো চিকিৎসার ওপর ভরসা করেই কাটাতে হয় আক্রান্তকে। নতুন আবিষ্কার সেই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

● **হৃদরোগ নিয়ে নতুন তথ্য :**

ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেল্‌থ বিভাগের একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি হৃদরোগের সম্ভাব্য কারণ নিয়ে নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। বিস্তর গবেষণার পর তাঁরা দেখিয়েছেন যে, স্যাচুরেটেড ফ্যাটের সঙ্গে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানীর পরিভাষায় খাদ্যস্থিত ফ্যাট 'ট্রাইগ্লিসারেল', যা তৈরি হয় মূলত তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড ও একটি গ্লিসারল 'এস্টার' নামে একটি বিশেষ রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত। বন্ধনের প্রকৃতি অনুসারে ('ডাব্‌ল বন্ড' বা 'সিঙ্গল বন্ড') ফ্যাটকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট। এই ফ্যাটের সঙ্গে হৃদরোগের কোনও সম্ভাবনা নেই।

● **উষ্ণায়ন রুখতে পিঁপড়ে :**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের দাবি, প্রকৃতিতে উষ্ণায়ন রুখতে পিঁপড়েরাও তৎপর। তাঁদের বক্তব্য, পরিবেশের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাটিতে 'বন্দি' করে চলেছে কয়েকটি প্রজাতির পিঁপড়ে।

গবেষকদের এই সমীক্ষার খুঁটিনাটি তথ্য প্রকাশিত হয় 'জিওলজি' পত্রিকায়। বলা হয়েছে, পিঁপড়ের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে কম মাত্রায় হলেও পরিবেশ পরিবর্তনের যোগসূত্র রয়েছে। বাসা গড়তে তারা খনিজ-সমৃদ্ধ বালুকণা সংগ্রহ করে। পিঁপড়ের দেহ-নিঃসৃত রস সেসব কণায় মিশলে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। তার জেরে কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্যালশিয়াম কার্বনেট (চুনাপাথর) নামের যৌগ পদার্থ তৈরি হয় বলে গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, জলের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড সেটির সংস্পর্শে এলে গঠিত হয় ক্যালশিয়াম বাই-কার্বনেট। এতে বাতাস থেকে অল্প হলেও ওই 'গ্রিনহাউস গ্যাসের' পরিমাণ কমে।

● **মঙ্গল অভিযানের নেতৃত্বে প্রথম মহিলা :**

মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না, এখন না থাকলেও কোনও কালে ছিল কি না, এই প্রশ্নের জবাব পেতে ২০২০ সালে পরবর্তী মিশন পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র 'নাসা' (ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)। আর ওই অভিযানের নেতৃত্বে থাকছেন অস্ট্রেলিয়ার ভূতত্ত্ববিদ আবিগাইল অ্যালউড। 'নাসা'-র তরফে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। 'নাসা'-র ইতিহাসে এই প্রথম একজন মহিলা মহাকাশ অভিযানের নেতৃত্ব পেলেন।

● **ডাইনোসর থেকে পাখি :**

অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল জীবাশ্মবিদ এক গবেষণাপত্রে জানান, বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বিশালকায় ডাইনোসরই বিবর্তনের পথ বেয়ে আজকের পাখিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের দাবি বিশালকায় লম্বা লম্বা ডাইনোসরগুলোর বিবর্তনের পদ্ধতিতে ছিল 'মিনিয়েচারাইজেশন'। অর্থাৎ ক্ষুদ্রকরণ। ৫ কোটি বছর ধরে ক্রমশ ছোট হয়েছে। ১২টা শাখায় বিভক্ত হয়েছে। তারপর এসেছে আজকের পাখি।

● **কৃষ্ণগহ্বরের প্রকৃত অবস্থান :**

এতদিন যা নিছক হিসেবনিকেশের মধ্যে আটকে ছিল, সেই মাঝারি মাপের ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরের প্রকৃত অবস্থান বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র 'নাসা'-র ভারতীয় বংশোদ্ভূত গবেষক ধীরাজ পাশাম।

খেলার জগৎ

● **ঐতিহাসিক লর্ডসে জয়ী হলেও সিরিজ হারাল ভারত :**

ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ টেস্টের সিরিজ ৩-১-এ হেরে দেশে ফিরল ভারত। টেন্ট ব্রিজে প্রথম টেস্ট ড্র হয়। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে ভারত ৯৫ রানে হারায় ইংল্যান্ডকে দীর্ঘ ২৮ বছর পরে। সাউদাম্পটনে ইংল্যান্ড জয়ী হয় ২৬৬ রানে। ম্যাঞ্চেস্টারে চতুর্থ টেস্টে ভারত হারে এক ইনিংস ও ৫৪ রানে। আর ওভাল ময়দানে পঞ্চম ও শেষ টেস্টে ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ২৪৪ রানে ভারতকে হারিয়ে ৩-১ সিরিজ জিতে নেয় ইংল্যান্ড। পাঁচটি টেস্টে ২৫টি উইকেট দখল করে ইংল্যান্ডের জিমি অ্যান্ডারসন 'ম্যান অফ দ্য সিরিজ' হন।

● **কমনওয়েলথ গেমসে পদক তালিকায় ভারতের পঞ্চম স্থান :**

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় আয়োজিত ২০তম কমনওয়েলথ গেমসে ১৫টি সোনা, ৩০টি রুপো ও ১৯টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে ভারত পঞ্চম স্থান দখল করল। প্রথম স্থানে ইংল্যান্ড (৫৮ সোনা, রুপো ৫৭ এবং ব্রোঞ্জ ৫৬)। ৪৭টি সোনা, ৪২টি রুপো ও ৪৬টি ব্রোঞ্জ পেয়ে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয় স্থানে কানাডা (৩২টি সোনা, ১৫টি রুপো ও ৩৪টি ব্রোঞ্জ)। পদক তালিকায় চতুর্থ স্থান পেল আয়োজক স্কটল্যান্ড। তাদের দখলে ১৯টি সোনা, ১৫টি রুপো ও ১৯টি ব্রোঞ্জ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১০-এ নতুন দিল্লিতে ১৯তম গেমসে ভারত ৩৮টি সোনা, ২৭টি রুপো ও ৩৬টি ব্রোঞ্জ, মোট ১০১টি পদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল।

● **হুইল চেয়ার কোচের বিশেষ স্বীকৃতি :**

হুইল চেয়ারে বসে কোচিং করে যিনি সারা ফুটবল বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন, সেই সোহেল রেহমানকে নতুন স্বীকৃতি দিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সোহেলকে ম্যাঞ্চেস্টার তাদের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ফুটবল অ্যাকাডেমির অন্যতম কোচ নিযুক্ত করল। সানডে লিগ ফুটবলে কোচিংয়ে হাতেখড়ি। এবার পেশাদার ফুটবলে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পেশাদার ফুটবলে সোহেল-ই প্রথম হুইল চেয়ার কোচ।

● **ইংল্যান্ডে টেস্ট জিতল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল :**

দীর্ঘ ৮ বছর পর টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নেমে ভারতীয় মহিলা দল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক টেস্টের সিরিজ জিতে নিল। ওয়ার্মসলেতে ভারতীয় দল ৬ উইকেটে হারিয়ে দিল ইংল্যান্ডের মেয়েদের। ২০০৬ সালে ভারতের মেয়েরা শেষ টেস্ট খেলেছিল। সেবারও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত জিতেছিল ৫ উইকেটে।

● **মার্কিন তরুণী সাঁতারুর বিশ্বরেকর্ড :**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সাঁতারু কেটি লেডিক ফের শিরোনামে। সপ্তদশী কেটির পুরস্কার জয়ের সংখ্যা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। এবার সেই তালিকায় আরও একটি সংযোজন। ইউএসএ ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে চারশো মিটার ফ্রিস্টাইলে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন তিনি। এর আগেও কেটি লন্ডন অলিম্পিকে ৮০০ মিটারে এবং বার্সোলোনায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে চারটি সোনা জিতেছেন।

● **রজার্স কাপ টেনিস খেতাব রাদওয়ানেস্কা ও সঙ্গা-র :**

রজার্স কাপ টেনিসে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জিতে নিলেন পোল্যান্ডের আগনিয়েশকা রাদওয়ানেস্কা। ফাইনালে তিনি হারান ওই ট্রফির অন্যতম দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেনাস উইলিয়াম-কে।

অন্যদিকে, পুরুষদের খেতাব জিতলেন ফ্রান্সের টেনিস তারকা জো উইলফ্রেড সঙ্গা। ফাইনালে তিনি ৭-৫, ৭-৬ সেটে হারান ১৭টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী সুইৎজারল্যান্ডের রজার ফেডেরার-কে।

বিবিধ সংবাদ

● **আন্তর্জাতিক সম্মান ভারতীয় সংস্থা-কে :**

হরিয়ানার ধর্ষিতা নারীদের পুনর্বাসনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিতে এ বছরের 'বেস্ট ইন্ডিয়ান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ফর এ সোশ্যাল কজ' সম্মান পেল কেডি সিং ফাউন্ডেশন। সংস্থার কর্ণধার তৃণমূল কংগ্রেস-এর রাজ্যসভা সাংসদ কেডি সিং-এর হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে প্রতি বছর এই সম্মান জানায় লন্ডনের 'গ্লোবাল এক্সেলেন্স সামিট'।

● **বারো বছর পরে উদ্ধার মাতিসের হারানো ছবি :**

নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বারো বছর পরে ভেনেজুয়েলায় ফিরে এল বিশ্ববন্দিত ফরাসি চিত্রকর আঁরি মাতিসের আঁকা একটি ছবি। 'ওদালিস্ক ইন রেড প্যান্টস' (লাল প্যান্ট পরিহিত পরিচারিকা) শীর্ষক ওই ছবিটি ১৯২৫ সালে আঁকা। ভেনেজুয়েলার 'ক্যারাকাস মিউজিয়ম অফ কনটেম্পোরারি আর্ট' গ্যালারিতে ছবিটি দীর্ঘকাল

সংরক্ষিত ছিল। ২০০২ সালে ছবিটি চুরি হয়ে যায়। সেই থেকে ছবিটির খোঁজ চলছিল। অবশেষে সম্প্রতি মিয়ামির একটি হোটেলে দুই ব্যক্তি মাতিসের ওই মহা মূল্যবান ছবিটি সাত লক্ষ ডলারে বিক্রি করতে গিয়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর হাতে ধরা পড়েন। অবশেষে ফ্লোরিডা পুলিশের সহায়তায় ছবিটি ভেনেজুয়েলার ক্যারাকাস আর্ট গ্যালারিতে ফিরে এসছে। বিশ্বখ্যাত চিত্রকরের ছবি উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে ললিতকলার জগতে।

● **লাদেনকে চিঠির হদিশ :**

পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদের ওয়াজিরিস্তান হাভেলি থেকে উদ্ধার করা হল একটি চিঠি। চিঠির প্রাপক আল কায়দার শীর্ষ নেতা ওসামা বিন লাদেন। ২১ পাতার দীর্ঘ ওই চিঠিটি লিখেছেন আল কায়দায় শীর্ষ স্থানে থাকা এক কম্যান্ডার। কয়েক বছর আগে লেখা হলেও চিঠির বিষয় বর্তমান পরিস্থিতিতেও সমান প্রাসঙ্গিক বলে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে। বলা হয়েছে, ইসলামি জঙ্গিদের অকারণ নিষ্ঠুরতা কীভাবে জনমানসে আল কায়দার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে, চিঠিতে সে বিষয়েই আলোকপাত করেছেন ওই আল কায়দা নেতা। নেতার মতে, যেভাবে ধর্মীয় স্থানে আক্রমণ, নির্মম অত্যাচার ও মুণ্ডচ্ছেদের পথ বেছে নিয়েছে জঙ্গিরা, তার পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। বাস্তবিক পক্ষে সেটাই ঘটেছে।

● **প্রয়াত ইজরায়েলি চলচ্চিত্র নির্মাতা :**

৮৫ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন ইজরায়েলি অ্যাকশন মুভি নির্মাতা মেনাহেম শোলান। প্রায় দুশোটি ছবির প্রযোজনা ও ৫০টি ছবি পরিচালনার কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। 'ডেল্টা ফোর্স', 'ডেথ উইশ', 'এনটেবে অপারেশন থান্ডারবোল্ট' এর মতো সাড়া জাগানো ছবি রয়েছে এই তালিকায়।

● **'আত্মঘাতী' রবিন উইলিয়ামস :**

বিশ্বখ্যাত কৌতুক অভিনেতা রবিন উইলিয়ামস (৬৩) প্রয়াত হলেন। সানফ্রান্সিসকোর উত্তরে ছোট শহর টাইবুরনে নিজের বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁকে। গলায় ফাঁসের চিহ্ন দেখে পুলিশের অনুমান 'আত্মঘাতী' হয়েছেন এই তুমুল জনপ্রিয় অভিনেতা। 'গুড মর্নিং ভিয়েতনাম', 'ডেড নোয়েটস সোসাইটি', 'গুড উইল হান্টিং', 'মিসেস ডাউটফায়ার' ইত্যাদি দুনিয়া কাঁপানো ছবিতে রবিনের অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

● **সর্বোচ্চ পাঁচ ধনীর সম্পত্তি :**

ভারতের সবচেয়ে ধনী পাঁচ ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পদের মিলিত পরিমাণ ৮৫৫০ কোটি ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় ৫,২৩,৮৯৭ কোটি টাকা। যা দেশের সকল শত কোটিপতিদের (বিলিয়নেয়ার) মিলিত সম্পদের অর্ধেক। সম্প্রতি প্রকাশিত ওয়েলথ-এক্স সমীক্ষা সংস্থার 'ওয়ার্ল্ড আল্ট্রা ওয়েলথ' শীর্ষ রিপোর্টে এই চমকপ্রদ তথ্য জানানো হয়েছে।

● **প্রয়াত বেকাল :**

হলিউডের প্রখ্যাত অভিনেত্রী লরেন বেকাল প্রয়াত হলেন। সাত দশকের জীবন সাঙ্গ করে ৮৯ বছর বয়সে চিরবিদায় নিলেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে 'টু হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাভ নট' ছবি দিয়ে শুরু বেকালের অভিনয় জীবন। তারপর শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। পরিণত বয়সে 'দ্য মিরর হ্যাজ টু ফেসেস' ছবির জন্য তিনি 'গোল্ডেন গ্লোব' পুরস্কার পান।

● **অঙ্কে 'নোবেল' ভারতীয় বংশোদ্ভূতের :**

'গণিতের নোবেল' হিসাবে পরিচিত 'ফিল্ডস মেডেল' সম্মান জিতে নিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান-যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিক মঞ্জুল ভার্গব। প্রায় দশ বছর ধরে গাণিতিক বিশ্বের মঞ্জুল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের এই তরুণ অধ্যাপকের হাতে ২০ আগস্ট সিওলে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথমেটিক্যাল ইউনিয়নে (IMU) পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সম্মানে 'নোবেল'-এর সমতুল হলেও, অর্থের বিচারে নিতান্তই 'ক্ষুদ্র' ফিল্ডস মেডেল। মাত্র ১৫ হাজার ডলার। যা নোবেল পুরস্কার মূল্যের প্রায় একশো ভাগের এক ভাগ।

● **'নবাব'-এর স্বীকৃতি মীরজাফরের বংশধরকে :**

১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধের পর ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বিকৃত চরিত্র মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসিয়েছিলেন লর্ড ক্লাইভ। সে দিন বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন ভারতের গ্লানির দীর্ঘ অধ্যায়ের সূচনা। ঠিক ২৫৭ বছর পর এবার সেই মীরজাফরের বংশধরকেই মুর্শিদাবাদের নবাব স্বীকৃতি ফিরিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর মুর্শিদাবাদের নবাবের স্বীকৃতি পেলেন আব্বাস আলি মির্জা।

● **চলে গেলেন নবারুণ ভট্টাচার্য :**

বিশিষ্ট সহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্য গত ৩১ জুলাই প্রয়াত হলেন। একাধারে কবি, গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে একটি স্বকীয় ধারা গড়ে তুলেছিলেন। নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা বিজন ভট্টাচার্য ও সমাজসেবী-সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর ছেলে নবারুণ ছিলেন আপসহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

● **'চাচা চৌধুরি'-র স্রষ্টা প্রয়াত :**

তাঁর সৃষ্টি 'চাচা চৌধুরি', 'সাবু', 'শ্রীমতীজি', 'রামন', 'পিঙ্কি'-র মতো কমিকস্ এক সময় মাতিয়ে তুলেছিল। হিন্দি পত্রিকা 'লোটপাট'-এ আত্মপ্রকাশ করে 'চাচা চৌধুরি' জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিল, সেই সাংবাদিক, ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী প্রাণকুমার শর্মা (৭৬) প্রয়াত হলেন ৫ই আগস্ট।

● **বাঙালি বিজ্ঞানীর আন্তর্জাতিক খেতাব :**

আব্দুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়োরিটিক্যাল ফিজিক্স (ICTP)-এর দেওয়া এ বছরের 'ডিরাক মেডেল' পান বাঙালি বিজ্ঞানী অশোক সেন। নোবেলজয়ী ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পল ডিরাকের নামাঙ্কিত এই পদ দেওয়া হয় তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার সেরা কৃতীর হাতে।□

সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত

জা নে ন কি?

রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা)

মলয় ঘোষ

বর্তমান সহস্রাব্দের দ্বিতীয় জনগণনাটি হয়েছে ২০১১ সালে। বলতে গেলে, ব্রিটিশ সরকারের নীতি মেনে ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা যে জনগণনা চালু করেছিল সেই অর্থে এটি পঞ্চদশ জনগণনা এবং স্বাধীনতার পর সপ্তম জনগণনা। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩১.১৬ শতাংশ বর্তমানে শহরাঞ্চলে বসবাস করে থাকে। জাতীয় জনসংখ্যা কমিশন পোষিত একটি শিক্ষা প্রতিবেদনের তথ্য বলছে ২০২৬ সাল নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৪০ কোটিতে। আর শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বেড়ে হবে প্রায় ৩৮ শতাংশের কাছাকাছি। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা সামগ্রিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই হবে শহরাঞ্চলে। শহরাঞ্চলের এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার একটি বড় সংখ্যা আবার দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন। গত ৬ জুলাই ২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের প্রাক্তন প্রধান সি রঙ্গরাজন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর কাছে দারিদ্রের হার নিয়ে রিপোর্ট পেশ করেছেন। রিপোর্ট বলছে, ভারতে প্রতি ১০ জনে ৩ জনই দরিদ্র। ওই রিপোর্টের হিসাব অনুযায়ী, শহরে যাদের দিনে ৪৭ টাকারও কম খরচে চালাতে হয়, তাদের দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী হিসেবে ধরতে হবে। যদিও এর আগে তেন্ডুলকর কমিটির সুপারিশে শহরের ক্ষেত্রে দারিদ্রের হিসাব ধরার জন্য টাকার পরিমাণ ৩৩ টাকা ধরা হয়েছিল। দেশ জুড়ে বিতর্কের পর ২০১৩ সালেই তেন্ডুলকর কমিটির সুপারিশ ফিরে দেখার জন্য তৈরি হয়েছিল রঙ্গরাজন কমিটি।

ভারতের মতো কল্যাণকামী রাষ্ট্রের একটি প্রধান দায়িত্ব হল তার নাগরিকদের জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিরও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি একটি প্রধান দায়িত্ব হল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। আর সেই লক্ষ্যেই রাষ্ট্রে একটি স্বাভাবিক দায়িত্ব থেকে যায়, যা হল সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের চিহ্নিত করা। যে পরিবারগুলির খাদ্য নিরাপত্তার অভাব রয়েছে তার জন্যও বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করা। অন্যথায় সেই পরিবারের মানুষগুলি তাঁদের বেঁচে থাকার স্বাভাবিক জীবনীশক্তি হারাবেন।

শহরাঞ্চলে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষজন মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমভিত্তিক কাজে নিযুক্ত থাকেন। এই মানুষজনের একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সামগ্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিক চিহ্নিতকরণের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পগুলির সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করে। প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্যই হল দরিদ্র শহরবাসীর জন্য সবরকম পরিষেবাকে সুনিশ্চিত করা। সেইসঙ্গে তাঁরা যে যে ধরনের অসহায়তা বা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন সেই সংক্রান্ত তথ্যের সংকলন এবং নির্ভুল বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে তাঁদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানো যায়।

শহরাঞ্চলের মানুষদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (State Urban Development Agency) বা সুডা (SUDA) বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প চালু করেছে।

১। আরবান সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম (USEP) এই কর্মসূচিতে ক্ষুদ্র শিল্প বা ব্যবসায় সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা প্রকল্পের জন্য ব্যাংক ঋণ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত অর্থাৎ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত সরকারি অনুদান পাওয়া যায়।

২। আরবান উইমেন সেল্ফ-হেল্প প্রোগ্রাম (UWSP) এই কর্মসূচিতে কমপক্ষে ৫ জন মহিলা একত্রিত হয়ে ব্যবসা করতে পারেন। এক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ সরকারি অনুদান, ৬০ শতাংশ ব্যাংক ঋণ ও নিজস্ব ৫ শতাংশ ব্যবসায় গোষ্ঠীর মূলধন হবে। সর্বোচ্চ অনুদানের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা হতে পারে। সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কোনও ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণদান গোষ্ঠী আবর্তক মূলধন পেতে পারে।

৩। স্কিল ট্রেনিং ফর এমপ্লয়মেন্ট প্রোমোশন এমংস্ট আরবান পুওর (STEP-UP) এই যোজনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মহিলা বা পুরুষদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। নার্সিং, কাঁথাস্টিচ, মোবাইল রিপেয়ারিং, মোটর মেকানিক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

৪। আরবান ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম (UWEP) এই কর্মসূচিতে বস্তি বা দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত এলাকায় গরিব মানুষদের শ্রমসম্পদকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্র উপযোগী সম্পদ তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রমমজুরি রাজ্য সরকার দ্বারা ঘোষিত সর্বনিম্ন মজুরি অনুযায়ী দেওয়া হয়ে থাকে।

৫। আরবান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (UCDN) এই কর্মসূচিতে পাড়া গোষ্ঠী সমিতি ও সমষ্টি উন্নয়ন সমিতির গঠন এবং সমন্বয় তৈরি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৬। ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশন (NULM) শহরাঞ্চলে দারিদ্রদূরীকরণে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনায় (২০১২-১৭) স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা (SJSRY)-এর পরিবর্তে NULM নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেছেন যা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিশদ নির্দেশিকা পাওয়ার পর রাজ্য ও পুরসভাস্তরে রূপায়িত হচ্ছে।

৭। জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়্যাল মিশন (JNNURM) এই প্রকল্পে রাজ্যের ছোট ও মাঝারি শহরে জল সরবরাহ সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে। এই প্রকল্পে সকলের জন্য নিরাপদ পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হচ্ছে।

৮। সুসংহত গৃহনির্মাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচি (IHSDP) জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়্যাল মিশনের অন্তর্গত সুসংহত গৃহনির্মাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন গৃহনির্মাণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। এই কাজের জন্য রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থাকে রাজ্যস্তরে নোডাল এজেন্সি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তিবাসীর জন্য গৃহনির্মাণ এবং বস্তির পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র শহরবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং বস্তি মুক্ত শহর গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৯। হাউজিং ফর আরবান পুওর (HUP) সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব আর্থিক আনুকূল্যে গৃহ ও বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপূরক এই যোজনায় দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী বস্তিবাসীদের নিজস্ব নতুন গৃহনির্মাণের সুযোগ দেওয়া হয়। নতুন গৃহনির্মাণের পাশাপাশি মেরামতিরও সংস্থান রয়েছে এই প্রকল্পে।

১০। আরবান স্ট্যাটিস্টিক্স ফর হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট (USHA) ভারত সরকারের দারিদ্রদূরীকরণ মন্ত্রকের আওতাধীন ন্যাশনাল বিল্ডিংস অর্গানাইজেশন (NBO) সারা ভারতে পৌরসভাভিত্তিক যতগুলি বস্তি আছে, তার একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি শুরু করা হয়েছে। এই সমীক্ষা থেকে পৌরসভাভিত্তিক নথিভুক্ত ও নথিভুক্ত নয় এইরকম সমস্ত বস্তির সংখ্যা, জমির মালিকানাস্বত্ব, বর্তমান পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সংরক্ষিত করে রাখা হচ্ছে।

১১। সুসংহত সুলভ শৌচাগার প্রকল্প (ILCS) আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা শহরবাসীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ শতাংশ, রাজ্য সরকার ১৫ শতাংশ এবং উপভোক্তা নিজে ১০ শতাংশ টাকা দিয়ে ১০ হাজার টাকা মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণের লক্ষ্যে অনুদান পাওয়ার সংস্থান আছে এই প্রকল্পে।

শহরাঞ্চলে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্প (IGNOAPS), ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবাভাতা (IGNWPS), ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী-ভাতা প্রকল্প (IGNDPS) যেমন রয়েছে তেমনি নগর সৌন্দর্যায়নের অঙ্গ হিসেবে আলংকারিক আলোকায়ন (অরনামেন্টাল অর ডেকরেটিভ স্ট্রিট লাইটিং)-এর কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। পৌর বিষয়ক দফতরের পরিচালনায় সাংসদ তহবিল অথবা বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থানুকূল্যে রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে এই কাজ চলছে।❑

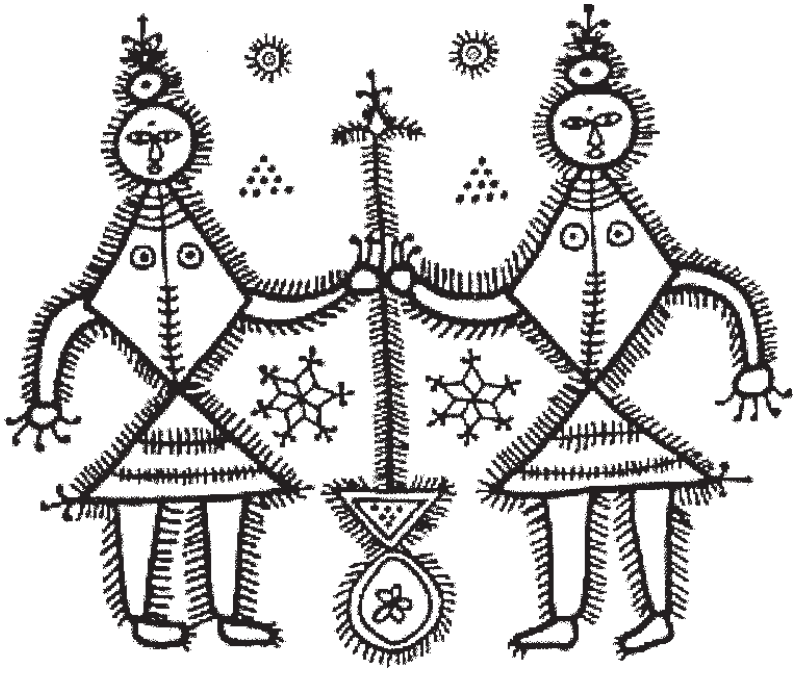

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভিস

মহুয়া গিরি

কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স বা (সিপিআই) থেকে মূল্যবৃদ্ধির হার জানা যায়। আর এই সিপিআই বা এর মতো অন্যান্য সমীক্ষার রিপোর্ট তৈরি করে যারা তাদের জন্যই রয়েছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভিস বা আইএসএস পরীক্ষা। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সমীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রালয় বা দফতরে। আদমশুমারি ছাড়া দেশে যতরকমের সরকারি সমীক্ষা হয় সেগুলি এই সমীক্ষকরাই করেন। দেশের জিডিপি বাড়ছে না কমছে, জনসংখ্যার মোট কত অংশ দারিদ্রসীমার নীচে, কত পরিমাণ জমি চাষযোগ্য কিংবা শিল্পের কাজে লাগছে, দেশের কত পরিমাণ জমিতে নগরায়ণ হয়েছে, কতটাই বা এখনও গ্রাম, সেচসেবিত জমির পরিমাণ কত—এমনই নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সমীক্ষা করে রিপোর্ট তৈরি করাই এদের কাজ। এইসব সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করেই দেশের বাজেট তৈরি হয়, তৈরি হয় কেন্দ্রীয় সরকারের নানা যোজনা, পরিকল্পনাও। যোজনা এবং পরিকল্পনাগুলিও বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা সেগুলি খতিয়ে দেখার দায়িত্বও এই সমীক্ষকদের।

চাকরি কোথায়

আইএসএস পরীক্ষায় পাশ করে সরাসরি যুক্ত হওয়া যায় মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিসটিকস-এ। এছাড়া প্ল্যানিং কমিশন, ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস, ন্যাশনাল অ্যাকাউন্ট ডিভিশন, শ্রম মন্ত্রক, জলসম্পদ মন্ত্রক, কৃষি মন্ত্রক প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারি দফতরে গেজেটেড অফিসার হিসেবে যোগ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

পদ

আইএসএস পরীক্ষায় পাশ করে চাকরির প্রথম ধাপেই গেজেটেড অফিসার হওয়া যায়। সুযোগ রয়েছে বদলিরও। আইএসএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কিছুদিন শিক্ষানবিশ অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর পদে নিয়োগ করা হয়। এই সময় হিন্দি ভাষা-শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব গঠনের মতো বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়। এরপর ধাপে ধাপে অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর, ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল, অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল, এমনকী শেষে ডিরেক্টর জেনারেল পদেও নিয়োগ করা হয়। এই পদমর্যাদা যেকোনও আইএএস অফিসার-এরই সমতুল্য।

যোগ্যতা

স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে স্ট্যাটিসটিকস, ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিসটিকস, অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে কেন্দ্র বা রাজ্যপরিষদ স্বীকৃত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করার পর আইএসএস পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করা যায়। ২০১৪ সালের সংশোধিত বিধি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, সংসদ এবং ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের অনুমোদন প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করলেও এই পরীক্ষায় বসার সুযোগ থাকে। তবে সেক্ষেত্রেও স্নাতক বা স্নাতকোত্তরের বিষয়গুলি স্ট্যাটিসটিকস, ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিসটিকস, অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিসটিকস হতে হবে।

পরীক্ষা

অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারি সর্বভারতীয় চাকরির পরীক্ষার মতোই আইএসএস পরীক্ষাও ইউপিএসসি-এর মাধ্যমে নেওয়া হয়। বছরে একবার পরীক্ষা হয়। সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ আইএসএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। পরীক্ষা হয় মে মাস নাগাদ।

প্রস্তুতি

স্ট্যাটিসটিকস-এর ছাত্র-ছাত্রীরাই যেহেতু এই পরীক্ষায় বসার সুযোগ পায় সেজন্য এন্ট্রান্স পরীক্ষাতেও স্ট্যাটিসটিকস-এর ওপরেই জোর দেওয়া হয়। ১০০০ নম্বরের লিখিত ও দুশো নম্বর ভাইভা—মোট ১২০০ নম্বরের পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের চারটি অর্থাৎ মোট ৮০০ নম্বরের স্ট্যাটিসটিকস-এর আবশ্যিক পেপার থাকে। এছাড়া থাকে ১০০ নম্বরের দুটি পেপার। বিষয় ইংরেজি ও জেনারেল স্টাডিজ। জেনারেল স্টাডিজের ১০০ নম্বরের মধ্যে থাকবে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের মতো বিষয়গুলি। ভাইভা বা ইন্টারভিউ পর্বে ব্যক্তিত্ব, কাজের দক্ষতা ও মানসিকতার ওপরেই জোর দেওয়া হয়।

সিভিল সার্ভিসের মতো পরীক্ষার জন্য দেশের অনেক জায়গায় কোচিং-এর ব্যবস্থা থাকলেও আইএসএস পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য তেমন খুব একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। তবে রাজস্থান, মুম্বই, দিল্লির কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আইএসএস-এর জন্য কোচিং দেওয়া হয়।❑

যোজনা ? কুইজ

১. স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাস গড়েছেন দীপা কর্মকার। তিনি কোন ইভেন্টে এই পদক পেয়েছেন?

২. ২০১৪ সালের বিশ্বখাদ্য পুরস্কার কাকে দেওয়া হয়েছে?

৩. ভারতের বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজটির নাম কী?

৪. ভারতের কোন রাজ্যে পুলিশবাহিনীতে ৩৩ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে?

৫. ২০১৪-র বিশ্বকাপ ফুটবলে জয়ী দেশটির নাম জার্মানি। কত বছর পর তারা এই সাফল্য পেল?

৬. 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থটির রচয়িতা 'শ্রীম' নামে পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম কী?

৭. ক্যানসার রোগীদের কল্যাণে 'গোলাপ দিবস' কোন দিনটিতে পালন করা হয়?

৮. এলসিডি (LCD)-এর সম্পূর্ণ অর্থ কী?

৯. ধোলাই করার সোডার রাসায়নিক নাম কী?

১০. টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া কোন সংস্থা তৈরি করে?

১১. ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উলগুলান উপজাতি বিদ্রোহ কে সংগঠিত করেছিলেন?

১২. ছন্দা গায়েন কোন শৃঙ্গ অভিযানের সময় নিখোঁজ হন?

১৩. 'বি টি রোডের ধারে' উপন্যাসটি কার লেখা?

১৪. এবছর কমনওয়েলথ গেমস্ অনুষ্ঠিত হয় স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে। চার বছর পর ২০১৮ সালে কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

১৫. ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরের মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্পে কোন রাজ্য অর্থ খরচের হিসাবের নিরিখে প্রথম স্থান অধিকার করেছে?

১৬. ক্রয় ক্ষমতার বিচারে বিশ্বে ভারত কততম দেশ?

উত্তর :

১. জিমন্যাস্টিক্স। ত্রিপুরার এই তরুণী নজির গড়েছেন। এছাড়ও প্রতিবন্ধী বাঙালি মেয়ে সাকিনা খাতুন ভারোত্তোলনে ব্রোঞ্জ পদক জিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ২. সঞ্জয় রাজারাম। বিশ্বব্যাপী গমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিনি যে অবদান রেখেছেন, তার জন্য এই পুরস্কার। পুরস্কার মূল্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। প্রথম এই পুরস্কার পান ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক এম. এস. স্বামীনাথন্। ১৯৮৭ সালে। ৩. আই এন এস বিক্রমাদিত্য। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই যুদ্ধ জাহাজটিকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। সাড়ে চুয়াল্লিশ হাজার টনের এই যুদ্ধ জাহাজটিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ৪. গুজরাত ৫. চব্বিশ বছর পর। এর আগে জার্মানি বিশ্বকাপ জিতেছিল, ১৯৫৪, ১৯৭৪ এবং ১৯৯০ সালে। ৬. মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ৭. ২২ সেপ্টেম্বর। ৮. লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে। ৯. সোডিয়াম কার্বোনেট। ১০. সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া। ১১. বিরসা মুন্ডা। ১২. কাঞ্চনজঙ্ঘা পশ্চিম (ইয়ালুংকাং)। ১৩. সমরেশ বসু। ১৪. অস্ট্রেলিয়ার গোল্ডকোস্টে। চার থেকে পনেরো এপ্রিল। ১৫. পশ্চিমবঙ্গ। প্রায় ৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করে বাজেটের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৬. তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। জাপানকে পিছিয়ে দিয়ে ভারত সম্প্রতি এই স্থানে উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংক এই তথ্য জানিয়েছে।

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

বস্তিমুক্ত ভারতের পরিপ্রেক্ষিত

যে চ্যালেঞ্জ জাতিকে গ্রহণ করতেই হবে

দেশের শহরগুলিকে বস্তিমুক্ত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গৃহীত এক বৃহৎ কর্মসূচি হল রাজীব আবাস যোজনা। বাস্তবক্ষেত্রে জমির দুষ্প্রাপ্যতা, বস্তিবাসীদের চিহ্নিতকরণ, ঋণ পরিশোধে তাঁদের অক্ষমতার মতো বিষয়গুলি কীভাবে এই প্রকল্প রূপায়ণের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে, লেখক **অমিতাভ কুণ্ডু** *তাঁর বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। সমস্যাগুলি থেকে উত্তরণের পথনির্দেশও রয়েছে এই নিবন্ধে।*

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

স্মার্ট শহরের পরিকল্পনা

কেন্দ্রের নতুন সরকার প্রথম বাজেটে ১০০টি স্মার্ট শহর গড়ার কথা ঘোষণা করেছে। স্মার্ট বলতে কী বোঝায় তার একটা ধারণা আছে এই নিবন্ধে। চ্যালেঞ্জ উতরে স্মার্ট শহর গড়ার পরিকল্পনা সফল করার দিশাও বাতলানো হয়েছে। শুধু ১০০টি শহর নয়, সবার কল্যাণে শহরগ্রাম নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি জনপদকে আরও স্মার্ট করে তোলার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন দুই লেখক **এস. চন্দ্রশেখর** ও **নীহারিকা ভেঙ্কটেশ**।

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

নগর মাঝে গ্রামীণ ইস্যু

গ্রামপ্রধান ভারতে শহর কোনও বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। সাদা ও কালোর মতো শহর এবং গ্রামকে দু'টি চরম ভাগে ভাগ করার দিন কাবার। গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে শহরের। ফলশ্রুতি—নগরজীবনে লক্ষণীয় গ্রামীণ প্রভাব। নিবন্ধটি কেবলমাত্র বেঙ্গালুরুর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছে। দেশের অধিকাংশ শহরের ক্ষেত্রে কিন্তু তা প্রযোজ্য। নগরে সেঁধানো গ্রামীণ ইস্যুর দিকে শহর নীতিতে নজর দেওয়া জরুরি, সওয়াল লিখছেন **নরেন্দর পানি।**

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতের নগর নীতি

অতীতাবলোকনে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ

নগরোন্নয়ন নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন গোড়া থেকেই নানা চিন্তাভাবনা, নানা প্রকল্প গ্রহণ করছে। কোথাও কোথাও অল্পবিস্তর তফাত ঘটলেও বড় শহর, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য বিবিধ সমস্যা মোটামুটি একই জায়গায় থেকে গেছে। সমাধান করা আজও সম্ভব হয়নি। এর কারণ একাধিক—কিছু প্রশাসনিক, কিছু অর্থকরী এবং কিছু ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংস্থার অপর্যাপ্ত ক্ষমতায়ন। একটি সর্বাঙ্গীণ চিত্র তুলে ধরছেন **আর বি ভগৎ।**

শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার কৃষি

শহর ছড়াচ্ছে। গ্রামের মানুষও শহরেই গিয়ে উঠছে। ফলে 'দাদুর দস্তানা'র গল্পের মতো শহর ফুলে ফেঁপে যেন ফেটে যাওয়ার উপক্রম। তার থেকে বড় এক সমস্যা হল ছড়াতে ছড়াতে শহরায়ণ প্রক্রিয়া এবার আশপাশের সবুজ ও কৃষি জমিকেও গ্রাস করছে। এই সমস্যা হয়তো ভবিষ্যতে গুরুতর হয়ে দেখা দেবে। আজ এবং কালের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কংক্রিট ও সবুজের সহাবস্থান কীভাবে ঘটানো যেতে পারে তা নিয়ে লিখছেন **সগর মৈত্র।**

নগর পরিকল্পনা—বাস্তবায়ন, সমস্যা ও পরিবর্তিত ধরন

ভারতের বিভিন্ন শহরে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ও সেই চাপজনিত নানা সমস্যা এড়ানোর উদ্দেশ্যে তার আশপাশে উপনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বহু অর্থ ব্যয় ও বিরাট উৎসাহ ও স্থপতিদের হিসেবনিকেশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এক একটা শহর। প্রথম দিকে সব ঠিকঠাক চলার পর ক্রমশ সেই শহরগুলিতেও দেখা দিয়েছে সমস্যা। কারণ, এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। অর্থাৎ কিনা পরিকল্পনা যতই ভালো হোক, তা বজায় রাখাটাও অত্যন্ত জরুরি। লিখছেন **মহুয়া বর্ধন।**

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতে প্রায় ৩১.২ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করে যা ২০০১ সালে ছিল ২৭.৮ শতাংশ। এর থেকেই বোঝা যায় ভারতে শহরে জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে আর মহানগরীগুলোর উপর চাপও বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের সমস্যা; যেমন—দূষণের সমস্যা, যানজট, আবাসন সমস্যা, পরিবেশগত সমস্যা ইত্যাদি। এসবের মোকাবিলা করার জন্য স্বাধীনতার পর থেকেই নানা সময়ে নানা স্থানে সুপরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা হয়। যদিও স্বাধীনতার আগেই শিল্পনগরী জামশেদপুর আর রাজস্থানের জয়পুর পরিকল্পিত শহর হিসাবে বেশ নাম করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রশাসনিক-ভাবে শহর গড়ে উঠতে থাকে মহানগরীর চাপ হ্রাসের জন্য। সাধারণত সরকারি উদ্যোগে এ ধরনের শহর গড়ে উঠলেও অতি সম্প্রতি বেসরকারি উদ্যোগেও ছোট ছোট আধুনিক ব্যক্তিগত শহরও গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। চণ্ডীগড়, গান্ধীনগরের মতো বড় বড় পরিকল্পিত শহরের পাশাপাশি সল্টলেক, কল্যাণীর মতো ছোট উপনগরী সবই ভারতের আধুনিক নগর পরিকল্পনার ফসল।

এ প্রসঙ্গে পরিকল্পিত শহরগুলোকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

ক) রাজধানী শহর—চণ্ডীগড়, গান্ধীনগর, ভুবনেশ্বর।

খ) নব্যনগর (New Town)—নভি মুম্বই, রাজারহাট-নিউটাউন।

গ) শিল্পশহর—দুর্গাপুর, হলদিয়া।

ঘ) উপনগরী—নয়ডা, সল্টলেক।

ঙ) বক্তিগত নগর— লাভাসা, অ্যাম্বিভ্যালি।

(ক) এই শহরগুলোর বৈশিষ্ট্য হল পরিকল্পনার আগে একটা নির্দিষ্ট মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয় যাতে ভূমি ব্যবহার, জনসংখ্যা, রাস্তাঘাট, পরিবেশগত বিষয় বিশদে আলোচিত হয়। (খ) সাধারণত গ্রাম্য ভূমি বা জনবসতিহীন ভূমিতেই নতুন করে শহর পত্তন হয়। (গ) প্রশাসনিক প্রয়োজনে এখানে পুরানো শহর থেকে অফিস আদালত ইত্যাদি স্থানান্তরিত হয়, (ঘ) এখানে বসতির সঙ্গে পরিষেবার এমন সাজুয্য থাকে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নগরী রূপে গড়ে ওঠে অর্থাৎ শহরের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ইত্যাদি প্রয়োজন শহরেই মেটানো সম্ভব। (ঙ) যদি মূল শহরের কাছেই এ ধরনের শহর তৈরি হয় তবে ধীরে ধীরে তা মূল শহরের সঙ্গে মিশে যায় (Expanded township)। (চ) কখনও কখনও বিশেষ উদ্দেশ্যে (বসতি, শিল্প, প্রশাসন) এ ধরনের শহর তৈরি হয় যার মূল পরিকল্পনা অক্ষুণ্ণ রেখে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে মহানগরীর সমস্যা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয় আর সর্বোপরি উদ্দেশ্য থাকে বাসিন্দাদের যতটা সম্ভব সুখস্বাছন্দ্য দেওয়ার।

এখানে ভারতের কতকগুলো মূল পরিকল্পিত শহরের উৎপত্তি। পরিকল্পনার ধরন আলোচনা করার পাশাপাশি শহরগুলো কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে তার আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ মূল মেট্রোপলিটন শহরগুলোর মতো অতটা না হলেও পরিকল্পিত শহরেও জমি সংকট পরিবেশ, পরিকাঠামো, আবাসন, বস্তি ইত্যাদি সমস্যা লেগেই থাকে যার থেকে প্রশ্ন ওঠে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের নগরায়ণ কি সঠিক পথে যাচ্ছে?

তালিকা-১
ভারতের প্রধান প্রধান পরিকল্পিত শহর

রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	শহর	আয়তন (বর্গকিমি)	মুখ্য উদ্দেশ্য	গড়ে ওঠার সময় (শুরু)	প্রধান স্থপতি
পশ্চিমবঙ্গ	দুর্গাপুর	১৫৪	শিল্প	১৯৫০	—
	কল্যাণী	২৯	বসতি	১৯৫৫	জেএন দাশগুপ্ত
	সল্টলেক	১২.৫	বসতি	১৯৬২	টস্কোভিক
	রাজারহাট-নিউটাউন	২৮	বসতি ও তথ্যপ্রযুক্ত	১৯৯৯	—
পঞ্জাব ও হরিয়ানা	চণ্ডীগড়	১১৪	প্রশাসনিক ও রাজধানী	১৯৬৬	লি করবুসিয়ের
ওড়িশা	ভুবনেশ্বর	১০৩৫	রাজধানী ও প্রশাসনিক	১৯৪৬	অটো-কোনিগস্‌বার্গার
গুজরাত	গান্ধীনগর	১৭৭	রাজধানী ও প্রশাসনিক	১৯৬৫-৭০	এইচ কে মেহওদা ও প্রকাশ আপ্টে
দিল্লি	নয়ডা	২০৩	শিল্প	১৯৭৬	—
মহারাষ্ট্র	নভি মুম্বই	১৬৩	বসতি	১৯৭২	চার্লস কোরিয়া
ছত্তিশগড়	নয়া রায়পুর	৮০.৪	বসতি ও প্রশাসনিক	সম্প্রতি	—